দাম : দশ টাকা

স্বস্তিকা

৬৭ বর্ষ, ৪১ সংখ্যা।। ৮ জুন ২০১৫।।
২৪ জ্যৈষ্ঠ - ১৪২২।। website : www.eswastika.com

মোদী সরকারের একবছর

With
Best
Compliments
From --

VAIBHAV HEAVY VEHICLES LTD.

স্বস্তিকা

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

যোগ

'যোগ' ভারতীয় মনীষার এক অতুলনীয় অবদান। হাজার হাজার বছর ধরে ভারতবর্ষের মানুষ যোগচর্চা করে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে পুষ্ট করে চলেছে। বিশ্বের বহু দেশেও এখন যোগ চর্চা হচ্ছে। সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর আহ্বানে সাড়া দিয়ে রাষ্ট্রসঙ্ঘ ২১ জুন তারিখটিকে আন্তর্জাতিক যোগদিবস হিসেবে ঘোষণা করেছে। স্বস্তিকা-র আগামী সংখ্যাটি 'যোগ' সংখ্যা হিসেবে প্রকাশিত হবে। লিখেছেন ডা: প্রেমসুন্দর দাস, মহামায়া রায়, ডাঃ নীরেন মজুমদার প্রমুখ।

সত্বর কপি বুক করুন। দাম একই থাকছে— দশ টাকা।।

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন,
বোলপুর,
মোবাইল -
৯২৩২৪০৯০৮৫

সানরাইজ®

সর্ষে পাউডার

SUNRISE® PURE

স্বাস্থ্য-সম্মত, ঝাঁঝালো - খেতে বড্ড ভালো।

স্বস্তিকা

।। কলকাতা ও আগরতলা থেকে একযোগে প্রকাশিত বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৬৭ বর্ষ ৪১ সংখ্যা, ২৪ জ্যৈষ্ঠ, ১৪২২ বঙ্গাব্দ

৮ জুন - ২০১৫, যুগাব্দ - ৫১১৭,

Website : www.eswastika.com

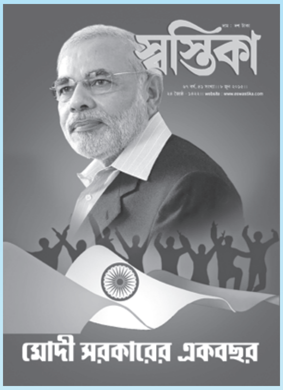

সম্পাদক : বিজয় আঢ্য

সহ সম্পাদক : নবকুমার ভট্টাচার্য, সুকেশ মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪

সার্কুলেশন : ৭২৭৮৪১৭৩১৬, ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১০ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৪০০ টাকা।

Postal Registration No.-Kol.RMS/48/2013-2015

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com
Website : www.eswastika.com

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১-বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা- ৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় □ ৭

সংবাদ প্রতিবেদন □ ৮-৯

খোলা চিঠি : জেলে আছি, জেলে নেই...
□ সুন্দর মৌলিক □ ১১

মোদী সরকারের প্রথম বছরে প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে কী উন্নয়ন ঘটল ? □ মে: জে: কে কে গঙ্গোপাধ্যায় (অবঃ) □ ১২

মোদী সরকারের একবছর □ দিব্যজ্যোতি চৌধুরী □ ১৪

মোদীর অর্থনীতি ও আমাদের অর্থনীতি
□ অম্লানকুসুম ঘোষ □ ১৯

মোদী এখন বিশ্ব দরবারে ভারতের শক্তির সওদাগর
□ সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় □ ২২

তৃতীয়পক্ষের চোখে মোদী সরকার □ নীতিন রায় □ ২৪

আরব দেশগুলিতে ভারতীয় মুসলমানদের বিব্রত জীবন
□ মুজফ্ফর হোসেন □ ২৭

মেমারীর সোমেশ্বরনাথের বিরল রজত মূর্তি
□ দেবপ্রসাদ সরকার □ ৩১

নিয়মিত বিভাগ

চিঠিপত্র : ২৯-৩০ □ **অঙ্গনা : ৩৩** □
পুস্তক প্রসঙ্গ : ৩৫ □ **সমাবেশ-সমাচার : ৩৬**
□ **খেলা : ৩৭-৩৯** □ **শব্দরূপ : ৪০**

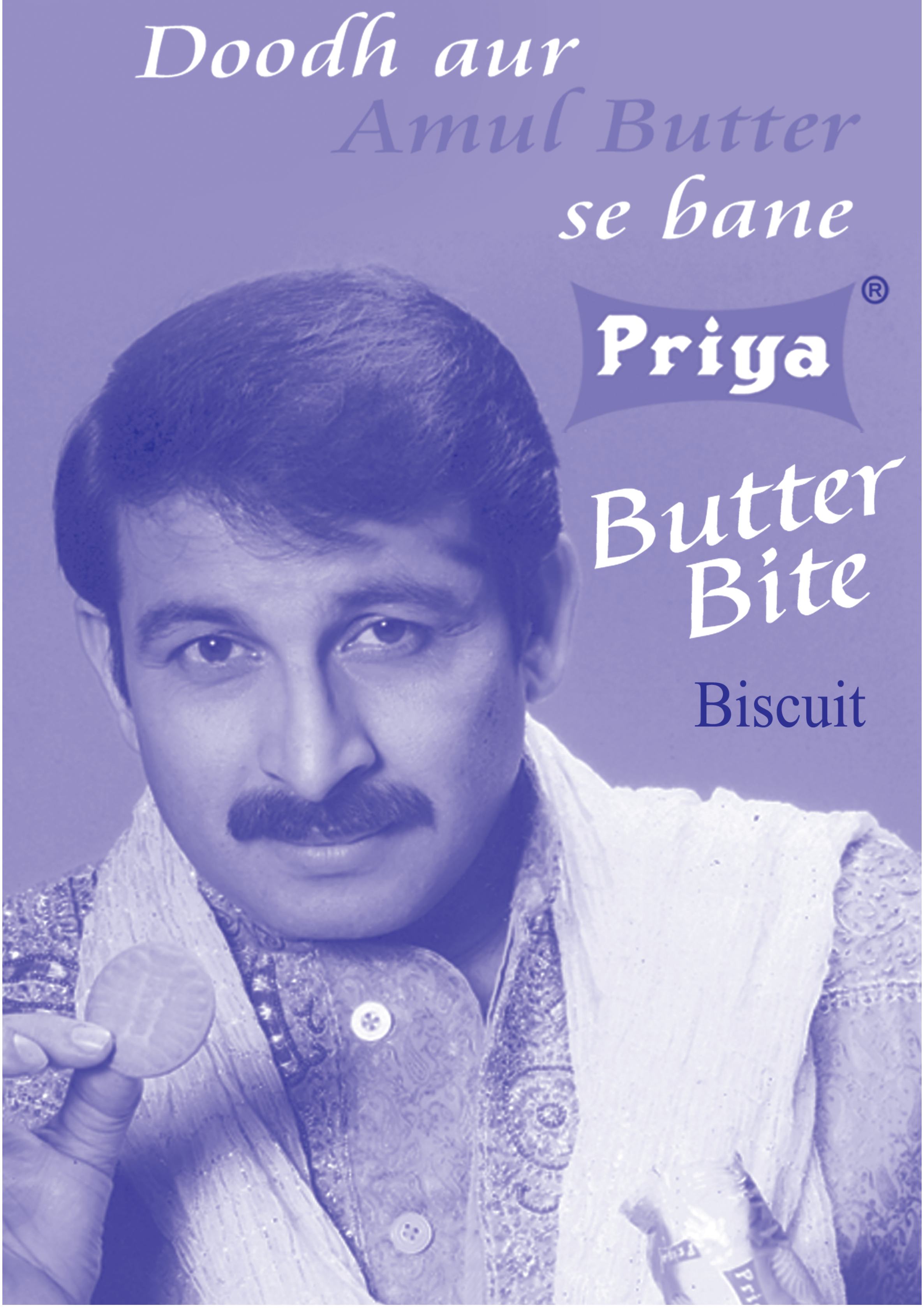
Doodh aur
Amul Butter
se bane
Priya®
Butter
Bite
Biscuit

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

হিন্দু শরণার্থীদের নাগরিকত্ব প্রদান

দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে যাঁহারা দেশভাগ মানিয়া লইয়াছিলেন তাঁহারা ভবিষ্যৎ পরিণতির কথা ভাবিয়া দেখেন নাই। দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে দেশভাগ হইবার পরেও ভারত হইয়া উঠিল ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র এবং ভারত হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যে রাষ্ট্রের জন্ম হইল তাহা ইসলামি রাষ্ট্রে পরিণত হইল। প্রথমদিন হইতেই যাহার আদর্শ হইল ভারত বিরোধিতা। ভারতে অহিন্দুরা পূর্ণ অধিকারে থাকিলেও পাকিস্তান ও বাংলাদেশে হিন্দু পীড়ন নিত্য দিনের ঘটনা। ভারতে অহিন্দুরা লাঞ্ছিত হইলে যাঁহারা আকাশ বাতাস কাঁপাইয়া প্রতিবাদ করিতে ভালোবাসেন তাঁহারাই আবার প্রতিবেশীরাষ্ট্রে হিন্দুরা অত্যাচারিত হইলে নীরব থাকেন। প্রতিবাদের এই দ্বিচারিতার ফলে প্রতিবেশী দেশ পাকিস্তানে হিন্দুদের নির্বিচারে হত্যা করা হইয়া থাকে। বাংলাদেশেও হিন্দুদের হত্যা, হিন্দুনারী ধর্ষণ, হিন্দুদের অর্থ সম্পত্তি লুঠ নিত্য চলে। ফলে অত্যাচারিত হিন্দুরা ভারতে চলিয়া আসিতে বাধ্য হয় অথবা সেই দেশ হইতে তাহাদেরকে খেদাইয়াও দেওয়া হয়। ইতিহাস বলিতেছে, স্বাধীনোত্তরকালে বাংলাদেশ হইতে সর্বস্ব হারাইয়া কত লক্ষ হিন্দু এই দেশে আসিয়া অসহায়ভাবে কালযাপন করিতেছেন তাহার পরিসীমা নাই। যাঁহারা মুসলমানদের উন্নয়নের জন্য গলা ফাটাইয়া থাকেন তাঁহারা কিন্তু মুসলমানদের অত্যাচারে অন্য দেশ হইতে আসিয়া শরণার্থী হিসাবে কালযাপন করিতেছেন তাঁহাদের জন্য গলা ফাটান না। কমিউনিস্টরা চিরকাল বাংলাদেশি শরণার্থীদের ভোটব্যাঙ্ক হিসাবে ব্যবহার করিয়াছে। আজ তৃণমূল করিতেছে। কিন্তু তাহাদের নাগরিকত্ব দিবার দাবি কাহারও মনে হয় নাই। পশ্চিমবঙ্গে হিন্দুদের জন্য যিনি আওয়াজ তুলিয়াছিলেন তিনি ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। সেই পরম্পরার উত্তরাধিকারী হইয়া প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আজ হিন্দু শরণার্থীদের ভারতের নাগরিকত্ব দিবার উদ্যোগ লইতেছেন।

লক্ষণীয়, একবছর আগে লোকসভা ভোটের প্রচারে আসিয়া নরেন্দ্র মোদী ঘোষণা করিয়াছিলেন, ক্ষমতায় আসিলে তাঁহার সরকার প্রতিবেশী রাষ্ট্র হইতে বিতাড়িত হিন্দু শরণার্থীদের ভারতের নাগরিকত্ব প্রদান করিবে। এই প্রসঙ্গে বিজেপি-র আদর্শ ও নীতি মানিয়াই মোদী বলিয়াছিলেন, ধর্মীয় কারণে যাঁহারা ওই সব দেশ হইতে বিতাড়িত হইয়াছেন, যাঁহারা দুর্গাপুজো করিয়া থাকেন তাঁহারা শরণার্থী হিসাবে গণ্য হইবেন, বাকিরা অনুপ্রবেশকারী। প্রধানমন্ত্রীর সেই ঘোষণা এইবার বাস্তবায়িত করিবার প্রচেষ্টা চলিতেছে। প্রধানমন্ত্রী স্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছেন, আমরা ধর্মীয় কারণে শরণার্থীদের বিরুদ্ধে কিছু বলিতেছি না। এই শরণার্থীদের হিন্দুস্থানে জায়গা হইবে না তো কোথায় হইবে? মুশকিল হইল পশ্চিমবঙ্গ এবং অসমে হিন্দু শরণার্থীরা অসহায়ভাবে দিন কাটাইতেছেন, অপরদিকে হাজার হাজার অনুপ্রবেশকারী এই দেশে সর্বরকমের সুযোগসুবিধা ভোগ করিয়া দিন কাটাইতেছেন। ভোটের কাঙাল রাজনৈতিক দলগুলি তাহাদের অনৈতিক উপায়ে রেশনকার্ড ও ভোটার কার্ড পাইবার বন্দোবস্ত করিয়া দিতেছেন। অনুপ্রবেশকারীরা সন্ত্রাসের বাতাবরণ সৃষ্টি করিতেছে।

প্রধানমন্ত্রীকে কেবল হিন্দু শরণার্থীদের ভারতের নাগরিকত্ব প্রদান করিলেই চলিবে না, বাংলাদেশে হিন্দু পীড়ন লইয়াও সোচ্চার হইতে হইবে। ধর্মীয় সহিষ্ণুতা লইয়া যাঁহারা অন্যকে উপদেশ প্রদান করিয়া থাকেন তাঁহাদের নিজেদেরও ধর্মীয় সহিষ্ণু হইবার প্রয়োজন। ভারত- বাংলাদেশের মধ্যে সম্পর্ক স্বাভাবিক রাখিতে হইলে বাংলাদেশে হিন্দু বাঙালির স্বার্থরক্ষা জরুরি। শরণার্থী হিসাবে তাঁহারা আসিতেই থাকিবেন। সুতরাং বাংলাদেশে প্রতিটি হিন্দুর স্বার্থরক্ষা জরুরি। সঙ্গে সঙ্গে এইদেশে অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের অবিলম্বে বিতাড়ন প্রয়োজন। কারণ সীমান্তে অনুপ্রবেশের ফলেই নানা অনৈতিক কার্যকলাপ বাড়িয়া গিয়াছে। এই সমস্যার সমাধান আশু প্রয়োজন।

সুভাষিতম্

বলবানপ্যশক্তোঽসৌ ধনবানপি নির্ধনঃ।
শ্রুতবানপি মূর্খোঽসৌ যো ধর্মবিমুখো জনঃ।।

যে ব্যক্তি ধর্ম (কর্তব্য) থেকে বিমুখ থাকেন, তিনি বলবান হয়েও বলহীন, ধনবান হয়েও নির্ধন এবং জ্ঞানী হয়েও মূর্খ হিসেবে বিবেচিত হন।

২১ জুন আন্তর্জাতিক যোগদিবসে অংশ নিচ্ছেন মোদী

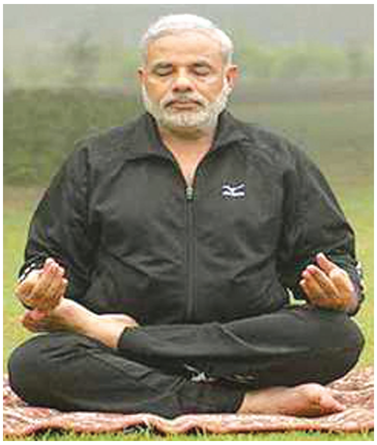

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ প্রথম আন্তর্জাতিক যোগদিবসে খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় দেখা যেতে চলেছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে। আগামী ২১ জুন ৪৫ হাজার মানুষের সঙ্গে তিনি নিজেই রাজপথে যোগ অনুশীলন করবেন। স্বাভাবিকভাবেই নিরাপত্তা-ব্যবস্থা ওই এলাকাটিতে আরও নিশ্ছিদ্র করা হচ্ছে এবং কেবলমাত্র আমন্ত্রিতরাই যাতে এতে প্রবেশ করতে পারেন সেই ব্যবস্থা করা হচ্ছে। রাজপথের ১.৪ কিলোমিটার দীর্ঘ অংশ যা শুরু হয়েছে বিজয়চক থেকে, শেষ হয়েছে ইন্ডিয়া গেটের সি-হেক্সাগনে। একে যোগ-ক্ষেত্র হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। মোরারজী দেশাই ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর যোগ এ নিয়ে একটি সিডি প্রকাশ করেছে। সেদিনে যোগ-প্রদর্শনে যাঁরা উপস্থিত হবেন তাঁদের অনুশীলনের কাজে এটি সহায়ক হবে বলে সরকারি সূত্রে খবর। ওইদিন জায়ান্ট স্ক্রিনে এটি প্রদর্শিত হবে অনুষ্ঠানস্থলে। শুধু রাজপথ-ই নয়, ১৭টি বড়ো ও ছোটো সংলগ্ন রাস্তা ও যোগে অংশগ্রহণকারী ব্যক্তিরা ব্যবহার করতে পারবেন। এখনও যদিও আমন্ত্রিতদের তালিকা চূড়ান্ত হয়নি, কিন্তু আপাত গ্রহণযোগ্য একটি তালিকা প্রস্তুত হয়েছে বলে খবর।

প্রসঙ্গত ভারতের অনুরোধেই রাষ্ট্রসঙ্ঘ ২১ জুন আন্তর্জাতিক যোগ দিবস হিসেবে ঘোষণা করেছে গত বছর। তাই এর প্রথম আয়োজনে যাতে কোনো ত্রুটি না থাকে সে ব্যাপারে সচেষ্ট দেশ। সরকারের বিভিন্ন আমলারাও যাতে এতে যোগ দেন তা সুনিশ্চিত করার চেষ্টা হচ্ছে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রকের পক্ষে এক বিজ্ঞপ্তি জারি করে বলা হয়েছে আণ্ডার সেক্রেটারি থেকে উচ্চ-মর্যাদার আধিকারিকরা আগামী ২১ জুন সকাল সাতটায় ৩৫ মিনিটের যোগ-কার্যক্রমে অবশ্যই অংশগ্রহণ করবেন। এ বিষয়ে একটি ওয়েবসাইটও চালু হয়েছে। সরকারের অন্যান্য মন্ত্রকও তাদের আমলা-আধিকারিকদের অনুরোধ করেছে যোগ কার্যক্রমে অংশ নেওয়ার জন্য। শুধু আমলা বা আধিকারিক-ই নয়, সাধারণ কর্মচারীদেরও এতে যোগ দেওয়ার জন্য আহ্বান জানানো হয়েছে। সরকারের যুক্তি, এর ফলে যাঁরা যোগে উৎসাহী, তাঁদের উপকার হবে। অনুচ্চারিত তত্ত্ব হলো, বিভিন্ন পদমর্যাদার মানুষ একসঙ্গে যোগ-কার্যক্রমে অংশ নিলে সনাতন ভারতীয় ঐতিহ্য মেনে পদমর্যাদা-সুলভ উন্নাসিক মানসিকতার পরিবর্তন হবে বলেই তথ্যাভিজ্ঞ মহলের আশা।

জীবন সংশয়ের জন্যই কি অসীমানন্দকে জেলে থাকতে বাধ্য করছে?

স্বামী অসীমানন্দ

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ সমঝোতা বিস্ফোরণ মামলায় তথাকথিত মূল অভিযুক্ত স্বামী অসীমানন্দ ৯ মাস আগে জামিন পেয়ে যাওয়ার পরও পাঞ্জাবের আম্বালা জেল থেকে মুক্তি পাচ্ছেন না। এই মর্মে তিনি বা তাঁর আইনজীবি কেউই নির্দিষ্ট অঙ্কের বেল বন্ডও আদালতে দাখিল করেননি। সংবাদে প্রকাশ, জেলের চার দেওয়ালের বাইরে তাঁর জীবন যে নিরাপদ নয় এমন একটা খবর বিভিন্ন নিরাপত্তা সংস্থার কাছে এসে পৌঁছেছে। ন্যাশনাল ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি-এর পরিচালনার পাঁচকুলার বিশেষ আদালতে চলা মামলায় অন্যান্য আরও কয়েকজনের সঙ্গে অভিযুক্ত হয়ে দীর্ঘ চার বছর আম্বালা জেলে রয়েছেন তিনি। প্রসঙ্গত, আম্বালা জেল থেকে জামিনে মুক্ত হওয়ার পর অসীমানন্দের হায়দরাবাদ বা রাজস্থানের আজমিরে অবস্থান করার কথা, কেননা তাঁর বিরুদ্ধে চলা এন আই এ-এর মামলাগুলি রাজস্থানের আজমের দরগা ও হায়দরাবাদ মক্কা মসজিদে বিস্ফোরণের কারণেই দায়ের করা হয়। তথ্যাভিজ্ঞ মহলের বক্তব্য অনুযায়ী উপরিউক্ত শর্তগুলি পুরণ করা আপাতদৃষ্টিতে অসীমানন্দের পক্ষে আদৌ কঠিন নয়। উচ্চ আদালতে তাঁর জামিন পাওয়ার পক্ষে সওয়াল করেন প্রসিদ্ধ আইনজীবী সত্যপাল জৈন, যিনি বিজেপি-র ও প্রবীণ নেতা। গত ২৪ আগস্ট ২০১৪-য় অসীমানন্দের দীর্ঘ কারাবাস, তাঁর বয়স ও আইনি প্রক্রিয়ায় দীর্ঘসূত্রতার পরিপ্রেক্ষিতে উচ্চ আদালত তাঁর জামিন মঞ্জুর করে। এন আই এ-এর অভিযোগ অনুযায়ী নিহত সুনীল যোশীর ডায়েরি ঘেঁটে সেখানে তারা স্বামী অসীমানন্দের নম্বর পায় যা তাঁদের মতে আপৎকালীন নম্বর হিসেবে রাখা হয়েছিল। ২০০৭ সালে ২৮ ফেব্রুয়ারির দিল্লী আটারি এক্সপ্রেসের বিস্ফোরণটি নাকি ভারত পাকিস্তান শান্তি প্রক্রিয়া বানচাল করতেই হিন্দু মৌলবাদী শক্তি দ্বারা পরিচালিত। অথচ আজ মামলার অভিযুক্তই সন্ত্রাসবাদী হামলায় জীবনহানির আশঙ্কা করছেন।

ফেসবুকে খুনের হুমকি বাংলাদেশের ব্লগার অনন্য আজাদকে

অনন্য আজাদ

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ সম্প্রতি 'দি গার্ডিয়ান' পত্রিকা সূত্রে প্রাপ্ত খবর অনুযায়ী বাংলাদেশি নাগরিক ও ব্যক্তিগত ব্লগে নিজস্ব মতামত প্রকাশ করতে অভ্যস্ত অনন্যা আজাদকে সে দেশের মৌলবাদী গোষ্ঠী প্রাণে মেরে দেওয়ার হুমকি দিয়েছে। বর্তমানে আজাদ নিদারুণ আতঙ্কের মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন। মৌলবাদী গোষ্ঠীর সনাক্তকরণ এড়াতে তিনি মাথায় পরচুলা ও হেলমেট পরছেন। ঢাকা থেকে পাঠানো সংবাদে তিনি বলেছেন, মৌলবাদীদের তৈরি ৮৪ জনের একটি হিটলিস্টে তাঁর নাম রেখে বলা হয়েছে তাঁর বাবা বিখ্যাত লেখক হুমায়ুন আজাদকে (যিনি রাজপথেই আততায়ীর আক্রমণে খুন হন) 'নাস্তিকদের সর্দার' বলে অভিহিত করা হচ্ছে। আজাদ বলেন, মৃত্যুর সঙ্গে তিনি ছোটবেলা থেকেই পরিচিত কিন্তু ফেসবুকে এঁরা যে ঘৃণ্য ভাষায় আক্রমণ করছেন তা অকল্পনীয়। ফেসবুকে বলা হয়েছে, আজাদকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত অবধি কেটে কেটে ফেলে রাখা হবে। প্রথমে তিনি এই মর্মে পুলিশে অভিযোগ জানাবার কথা ভেবেছিলেন কিন্তু ২৫ বছর বয়সী এই আদর্শনিষ্ঠ যুবকের কথায় ২১ বছর কেটে যাওয়ার পরও তাঁর নিহত পিতার খুনের কোনো কিনারা পুলিশ করতে পারেনি, তাই সে পথে যাওয়া নিরর্থক বলেই তাঁর বিশ্বাস। আজকাল কালো কাঁচ ঢাকা গাড়িতে যাতায়াত করা আজাদ অনতিবিলম্বে বাংলাদেশ ছেড়ে চলে যাওয়ার কথা ভাবছেন। তবে এই আতঙ্কের বাতাবরণে তিনি নিজের ব্লগে লেখা ইতিমধ্যেই বন্ধ করে দিয়েছেন। পরিবর্তে তিনি একটি বই লিখছেন। আগামী সপ্তাহে তাঁর ভারতে আসার পরিকল্পনা রয়েছে। তবে তাঁর ভ্রমণের পূর্ণ বিবরণ নিরাপত্তার কারণেই তিনি প্রকাশ করতে পারছেন না।

সংবাদ সূত্র অনুযায়ী, আজাদ একা নন, আরও এক সাধারণ ব্লগার মৌলবাদীদের শাসানিতে ঢাকায় আত্মগোপন করে আছেন। স্মরণে আসবে গত ১২ মে নির্ভীক ব্লগার অনন্ত বিজয় দাসকে মুখোশ পরা আক্রমণকারীরা নৃশংসভাবে খুন করেছে। এই ধরনের চরম মৌলবাদী আক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতে মুক্তবুদ্ধির লেখিকা বাংলাদেশ থেকে চির-নির্বাসিত তসলিমা নাসরিন নিউ ইয়র্ক থেকে আত্মগোপনকারী মনির হুসেনকে ঢাকা থেকে বিদেশে নিরাপদ স্থানে স্থানান্তরিত করার চেষ্টা করছেন। ইতিমধ্যে মৌলবাদীদের প্রাণনাশের হুমকিতে মনির তাঁর ব্লগ আপডেট করা বন্ধ করেছেন। ঢাকার কোনো অজ্ঞাত অঞ্চল থেকে জনাচ্ছেন, তিনি গত ১৫ দিন একটি ঘরে আবদ্ধ রয়েছেন। সেখানে না আছে কোনো টিভি, না কোনো সংবাদপত্র।

তসলিমা জানিয়েছেন, তিনি ইউরোপ ও আমেরিকার নানা সংগঠনের সঙ্গে যোগাযোগ করে আক্রান্ত ব্লগ লেখকদের সে দেশে নিয়ে যাওয়ার সব রকম চেষ্টা করছেন। তাঁর মতে, গোটা বাংলাদেশের স্বাধীন চিন্তা, মত প্রকাশ করে যাঁরাই ব্লগে লেখালেখি করেছেন তাঁরা সকলেই আজ প্রাণভয়ে ভীত, অথচ সরকার তাদের কোনো নিরাপত্তার ব্যবস্থা করছে না। পরিস্থিতির ভয়াবহতায় শ্রীমতী নাসরিন তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন।

বাহারিনের সর্বোচ্চ নাগরিক সম্মান পেলেন ড. অচ্যুত সামন্ত

ড. অচ্যুত সামন্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ বাহারিনের সর্বোচ্চ নাগরিক সম্মান 'ইসা অ্যাওয়ার্ড'-এ ভূষিত হলেন ড. অচ্যুত সামন্ত। ভুবনেশ্বরের কে আই আই টি (কিট) এবং কে আই আই এস (কিস)-র প্রতিষ্ঠাতা ড. সামন্তকে নিঃস্বার্থ মানব সেবার জন্য এই সম্মান প্রদান করা হয়। এই প্রথমবার কোনও ভারতীয় বাহারিনের সর্বোচ্চ নাগরিক সম্মান পেলেন। গত ৩ জুন তাঁকে এক মিলিয়ন ডলার অর্থ, স্বর্ণপদক ও মানপত্র দিয়ে সম্মানিত করা হয়।

কিট বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসম্পর্ক বিভাগ এক বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে, বনবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে শিক্ষা প্রসারে ও সেবা কাজের জন্য তাঁকে এই সম্মান দেওয়া হচ্ছে। বনবাসীদের সেবার কাজে সমর্পিত শিক্ষাবিদ ড. সামন্ত বাহারিনের ওই সম্মানের জন্য আন্তর্জাতিক নির্বাচক মণ্ডলীর দ্বারা নির্বাচিত হয়েছেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত কিট বিশ্ববিদ্যালয় ভারতের মানব সম্পদ বিকাশ মন্ত্রক থেকে 'এ গ্রেড'-এর মান্যতা পেয়েছে। এবার তাঁরই প্রতিষ্ঠিত কিস বিশ্বের সবচেয়ে বড় বনবাসী আবাসীয় বিদ্যালয় হিসেবে উঠে এলো, যেখানে ২৫ হাজার বনবাসী ছাত্রছাত্রীদের নিঃশুল্ক পড়াশোনা ও আন্তর্জাতিক মানের শিক্ষা লাভের ব্যবস্থা রয়েছে।

International Panaacea Limited
Farmer's First Choice
Bio-fertilizers
Bio-pesticides
Zinc Activator
rhizo
Soil Gold
Soil Shakti
PHOSTER
VAM SHAKTI
MILDOWN
Bactvipe
Kalichakra
MAHASTRA
Nematofree
Sanjeevni
RAKSHAK
Benefits of Bio-fertilizers & Bio-pesticides
Safe and Eco friendly
Rejuvenate soil and maintains fertility
Solution for sustainable agriculture & organic farming
Substitute of chemical fertilizers & pesticides
Chemical Pesticides are poisonous, causes cancer, damages agri land and the eco system.
A M2K Group Company

জেলে আছি জেলে নেই..

প্রিয় মদন দা
আলিপুর সেন্ট্রাল জেল
দাদা,

আবার আপনার নামে ফোঁস করেছেন কুণাল ঘোষ। আবার সেই একই ঘ্যানোর ঘ্যানোর প্রশ্ন, একজন জেলে থেকেও জেলে নেই, আমি কেন জেলে পচছি। বুঝতেই পারছেন গা জ্বলা কাকে বলে। আসলে কুণাল ঘোষ হতাশায় ভুগছেন। তিনিও তো এক সময় দিদির প্রাণের ভাই ছিলেন। কিন্তু ওনাকে আর কেউ ধর্তব্যের মধ্যেই আনছে না। তিনি এখন দলের সাসপেন্ডেড সাংসদ। অথচ জেলে বসেও মানে হাসপাতালে শুয়েও আপনি বহাল তবিয়তে রাজ্যের মন্ত্রী। একটা নয় দু'টো দপ্তরের স্বাধীন ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী। ফাইলপত্তরে সই করতে পারছেন না, নীতি নির্ধারণ করতে পারছেন না তবুও আপনি মন্ত্রী।

এখানেই কুণালবাবুর রাগ। তিনি তো সরাসরি আদালতে দাঁড়িয়েই এসব প্রশ্ন তুলছেন। ওদিকে আবার শুনছি আপনিও ইদানীং হতাশায় ভুগছেন। সত্যি করে বলুন তো জেলের সেলে না থেকে আপনি তো জেলেই আছেন। ইদানীং তো আপনার নাম দিদির মুখে শোনাই যাচ্ছে না। আপনার অনুগামীরা হোর্ডিং পোস্টার লাগিয়ে আপনার রাজনৈতিক জীবন টিকিয়ে রেখেছে ঠিকই কিন্তু দিদির করুণা কি পুরোপুরি পাচ্ছেন। গোপালও পেল না। গোপাল যে সুবোধ বালক নয়, সেকথা সবাই জানত। সঞ্জয় বক্সি থেকে সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় যাদের যাদের সঙ্গে গোপাল তিওয়ারির ছবি পাওয়া গেছে তাঁরা সকলেই জানতেন গোপাল এক চতুর বালক। গোলা, বন্দুক নিয়েই তার কারবার। ক'দিন আগেই সে এমনই এক কেসে ফেঁসে যায়। কিন্তু তখন তার গায়ে সুবোধ বালকের ছাপ ছিল। নেতা মন্ত্রীদের প্রভাবে পুলিশ তার টিকি ছুঁতে পারেনি। কিন্তু এবার ব্যাপারটা গোলমেলে হয়ে গেল। কোনো বিরোধীদলের ওপর হামলা চালালে জল অত দূর গড়াতো না। গোপাল এবং তার অনুগামীরা যা বয়ান দিয়েছে তাতে এক 'দাদা' এমনই নির্দেশ দিয়েছিলেন। বলেছিলেন কোনো গোলমাল হলে তিনি সামলে নেবেন। কিন্তু গোলমালটা হয়ে গেল পুলিশ আক্রান্ত হওয়ায়। মাথার ওপর থেকে সব ছাতা সরে গেছে। এখন কেউই নাকি গোপালকে চিনতে পারছেন না বলে জানিয়ে দিয়েছেন।

ঠিক একই পরিস্থিতি হয়েছে কুণালবাবুর। আপনারও তাই হবে না তো!

আসলে দিদি অপেক্ষায় আছেন কবে সারদা ইস্যু মিইয়ে যাবে। সেটা হলেই দিদি আবার ঘরের ভাইদের ঘরে নিয়ে আসবেন। আসলে দিদিও বুঝতে পারছেন না কোনোদিক দিয়ে সামলাবেন। দুধ কলা দিয়ে এত সাপ তিনি পুষেছেন যে তার আর হিসেব নেই। ওদিকে সিউড়ির বিধায়ক স্বপনকান্তি ঘোষ বলে বেড়াচ্ছেন, ২০১১ সালের ভোটের সময় তাদের সবাইকে দলের পক্ষ থেকে ১৫ লক্ষ করে টাকা দেওয়া হয়েছিল। এদিকে গোপাল, ওদিকে কুণাল, আবার আপনিও নাকি ফোঁস করেছেন। দোহাই দাদা, আপনি আর দিদিকে বিপাকে ফেলবেন না প্লিজ।

ওদিকে আবার রাষ্ট্রপতি মহোদয় অর্থলগ্নি বিলে সম্মতি দিয়ে দিয়েছিলেন। ফলে এখন আইনে রূপায়ণ করার দায় চাপছে সরকারের ওপর। সারদাকাণ্ড সামনে আসার পর দিদিই উদ্যোগ নিয়েছিলেন এমন একটা আইন বানানোর। সেটা ছিল ভোট উতরানোর কায়দা। কে আর ভেবেছিল একদিন সেই বিল আইন করার দাবিতে বিধানসভায় শোরগোল হবে! বেসরকারি অর্থলগ্নি সংস্থার রমরমা রোখার লক্ষ্যে বিধানসভায় পাশ হওয়া বিলে রাষ্ট্রপতি ভবনের অনুমোদন মেলার পরও রাজ্য সরকার কেন আইন বানানোর উদ্যোগ নিচ্ছে না এটা কিন্তু আমারও মাথায় ঢুকছে না।

হাত পুড়িয়েও কি দিদির শিক্ষা হয়নি? ২০১৬ সালের ভোটেও কি সেই চিটফান্ডের টাকাতেই লড়তে চাইছেন?

— **সুন্দর মৌলিক**

মোদী সরকারের প্রথম বছরে প্রতি

মেঃ জেঃ কে কে গঙ্গোপাধ্যায়
(অঃবঃ)

মোদী সরকারের কেন্দ্রে ক্ষমতায় আসার প্রথম বর্ষ সম্পূর্ণ হয়েছে। বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষজ্ঞরা এই সরকারের এক বছরের সাফল্য তুলে ধরেছেন। এটা মনে রাখা প্রয়োজন, যে কোনো সরকারের প্রথম বছর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ নির্বাচনের আগে দল নির্বাচকদের যে ম্যানিফেস্টো দেয়, তার ভিত্তি এই প্রথম বছরেই পত্তন করতে হয়। প্রথম বছরে সেই ভিত কতটা পাকাপোক্ত ভাবে রাখা হলো, সেটাই বিচার করার বিষয়। প্রথমত, বিগত সরকারের নীতি এবং দুর্নীতির প্রভাব এই নতুন সরকারের প্রথম বছরে প্রবল থাকে। সেই ধারা কাটিয়ে উঠে নতুন সরকারকে নিজস্ব ধারায় সরকার চালাতে হবে। নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লোকসভায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে ভাল সুযোগ করে দিয়েছে।

দ্বিতীয়ত, প্রধানমন্ত্রী প্রথম থেকেই তাঁর প্রধান নীতিগুলি সহজ ভাষায় সকলকে জানিয়ে দিয়েছেন, উন্নয়নই তাঁর মূলমন্ত্র। ‘সবকে লিয়ে সবকে সাথ’। ‘ভারতে নির্মাণ কর’ ‘মেক ইন ইন্ডিয়া’।

তৃতীয়ত, সার্ক রাষ্ট্রসমূহ এবং এশিয়ার সমস্ত রাষ্ট্রের সঙ্গে সু-সম্পর্ক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক আদান প্রদান গভীর করা। মতবিরোধ থাকতে পারে কিন্তু তার উপরে উঠে বন্ধুত্বের পরিবেশ সৃষ্টি করতে তিনি সকলকে আহ্বান করেছেন। শপথ গ্রহণের দিন থেকে তিনি বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রে নিরন্তর সফর করে এই বার্তাই সকলকে দিয়েছেন। সমস্ত রাষ্ট্রই তাঁকে বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে।

ভারতের প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে এই বিষয়ে কী প্রভাব পড়তে পারে সেটা বিশেষ করে প্রণিধানযোগ্য। মাত্র দুটি প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে সীমান্ত নিয়ে ভারতের গুরুত্বপূর্ণ বিরোধ আছে। পাকিস্তান মনে করে ভারত অন্যায়ভাবে কাশ্মীর দখল করে রয়েছে, যেহেতু কাশ্মীরের জনসংখ্যায় মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষ সংখ্যাগরিষ্ঠ। রাষ্ট্রসঙ্ঘের সুরক্ষা সমিতির প্রতিবেদন আজও কার্যকর হয়নি। এটাই তাদের অভিযোগ। কিন্তু তারা ভুলে যায় দেশ বিভাজনের সময় করদ রাজ্যের মহারাজা অথবা নবাবদের যে রাষ্ট্রে ইচ্ছা সেখানেই যোগদানের অধিকার ছিল। তারা একথাও বলে না, সুরক্ষা সমিতির প্রতিবেদনের ভিত্তিতে (রেজলিউসন) তাদের পালনীয় একটি শর্তও তারা পালন করেনি। রাষ্ট্রসঙ্ঘের মহাসচিবরা মত দিয়েছেন যে, এই প্রতিবেদন এখন মৃত।

পাকিস্তান অন্তত দু-বার ভারত আক্রমণ করেছে। প্রাক্তন পাক প্রেসিডেন্ট জেনারেল মোশারফ এখনও বলছেন, ‘‘কার্গিলে পাকিস্তান ভারতের বিরুদ্ধে জেহাদি ছায়াযুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে এবং নানাভাবে ভারতের বিরুদ্ধে সশস্ত্র শত্রুতা করছে। পাকিস্তান পরমাণু অস্ত্রধর দেশ। চীন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার বিশেষ বন্ধুরাষ্ট্র।

ভারতের অপর প্রতিবেশী মহাশক্তিধর চীন। ভারতের অরুণাচল প্রদেশ এবং লাদাখের নিকট আকসাই চীন দক্ষিণ তিব্বতের অন্তর্ভুক্ত বলে চীন নিজের ভূখণ্ড হিসাবে দাবি করেছে। ১৯৬২ খৃষ্টাব্দে এই অঞ্চল আক্রমণ করে বমডিলা পর্যন্ত এবং লোহিত ডিভিসনে বহুদূর ভারত ভূখণ্ড অধিকার করে নিয়েছিল। তারা তিব্বতে সামরিক পরিকাঠামো গত ৫০ বছরে এতটা উন্নত করেছে যে ভারত-চীন সীমান্তের যে কোনো অঞ্চলে ৫০-৬০ ডিভিসন সৈন্য সহজেই সমাবেশ করতে সমর্থ।

পাকিস্তান তুলনায় কম শক্তিধর শত্রু হলেও ভারতের অনেক ক্ষতি করতে পারে। ভারতকে সবসময় নিয়ন্ত্রণরেখায় (এলওসি) বহু সৈন্য মোতায়েন রাখতে হয় অনুপ্রবেশ রোধ করতে। প্রায় প্রতিদিন অস্ত্রবিরতি লঙ্ঘন করে তারা ভারতীয় ঘাঁটি ও গ্রামে গোলাগুলি বর্ষণ করছে।

বিগত ৫০ বছরে ভারত ও চীন বহুবার আলোচনা করেছে শান্তিপূর্ণভাবে সীমান্ত

ফ্রান্সের এই অত্যাধুনিক ‘রাফেল’ যুদ্ধ বিমান কিনছে ভারত।

রক্ষার ক্ষেত্রে কী উন্নয়ন ঘটল ?

সমস্যার সমাধান করতে। চীন ম্যাকমোহন লাইন মানে না। কিন্তু এই সমস্যা সমাধানের কোনো প্রগতিই হয়নি। বরং চীনের সামরিক বাহিনী প্রায়ই ভারতের নিয়ন্ত্রণরেখায় ইচ্ছামত প্রবেশ করে চলেছে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার কয়েকটি বিষয় আলোচনা করা প্রয়োজন। সেই পরিপ্রেক্ষিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সরকার কী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে তা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। প্রকৃত অবস্থা যদিও জানা সম্ভব নয়, তবু সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, বিভিন্ন ধরনের অ্যামুনেশনের ভাণ্ডার এতটাই তলানিতে যে ১০-১২ দিনের বেশি যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। মাউন্টেন সনহাওয়াইটজার যা পর্বতীয় যুদ্ধে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, তা আজও আমদানি করা সম্ভব হয়নি। বিমানবাহিনীর লড়াকু বিমানগুলি দু'দশকের পুরাতন। রাশিয়া থেকে ক্রয় করা সুকোই বিমান বিগত কয়েক মাসে কয়েকটি ভেঙে পড়েছে। সম্প্রতি একটি বিমান আবার ভেঙে পড়েছে। ইঞ্জিনের সমস্যা। কিছুদিন আগে একটি সাবমেরিন হঠাৎ আগুন লেগে জলমগ্ন হলো।

এমতাবস্থায় প্রধানমন্ত্রী ফ্রান্সের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ৩৬টি রাফেল লড়াকু বিমান সরাসরি ক্রয় করার চুক্তি করে অবস্থা সামাল দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। বাকি ২৩০টি বিমান যাতে ভারতে নির্মাণ করা যায় সেই বিষয়ে আলোচনা চলছে। এই ক্রয় প্রকল্পটি বেশ কিছুদিন যাবৎ সহমত না হওয়ায় আটকে ছিল।

প্রধানমন্ত্রী অস্ট্রেলিয়া সফরে গিয়ে সেই রাষ্ট্রের অনড় মনোভাবের পরিবর্তন ঘটিয়ে ভারতকে ইউরেনিয়ম সরবরাহে রাজি করাতে সক্ষম হয়েছেন। একইভাবে কানাডা সফরে গিয়ে তাদের ভ্রান্তধারণা দূর করে ভারতকে ইউরেনিয়ম সরবরাহে রাজি করিয়েছেন। এই বিষয়ে চুক্তিও স্বাক্ষরিত হয়েছে।

জার্মানি, ফ্রান্স, যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডায় ভারতে শিল্প স্থাপনে, বিশেষ করে প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে বিনিয়োগের জন্য শিল্পপতিদের অনুরোধ করেছেন। তাঁদের ইঙ্গিত উৎসাহব্যঞ্জক।

কিন্তু বহু বছর যাবৎ ভারত-চীন সীমান্তে সড়ক নির্মাণ ও অন্য পরিকাঠামো উন্নয়ন স্তব্ধ হয়ে রয়েছে। জানা যাচ্ছে এ বিষয়ে প্রতিরক্ষা মন্ত্রক দ্রুত অর্থ বরাদ্দ করে এই কাজে অগ্রসর হওয়ার নির্দেশ দিয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর সাম্প্রতিক চীন সফরে অনেক মউ স্বাক্ষরিত হয়েছে, সদিচ্ছার প্রকাশ হয়েছে, কিন্তু চীন সরকার সীমান্ত সমস্যা সমাধানে কোনো আলোচনা করতে চায়নি। এমনকী অরুণাচল ও লাদাকে নিয়ন্ত্রণ রেখা স্থির করতেও তারা আগ্রহ দেখায়নি। এমতাবস্থায় চীন সীমান্তে ভারতের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সুদৃঢ় করাই ভারতের পক্ষে একমাত্র বিকল্প। আশা করব মোদী সরকার এটা বুঝে ব্যবস্থা নেবে।

বিগত চার পাঁচ বছর যাবৎ ভারতের পদাতিক বাহিনী তাঁদের ব্যক্তিগত অস্ত্রের পরিবর্তন চাইছিলেন (অ্যাসল্ট রাইফেল)। বিভিন্ন রাষ্ট্রের অস্ত্র নির্মাণ প্রতিষ্ঠান তাদের অস্ত্রের পরীক্ষণও দিয়েছিল। কিন্তু এখন কর্তৃপক্ষের মনে হয়েছে, যা চাওয়া হয়েছিল তা প্রয়োজন মেটাবে না। অতএব আবার নতুন করে দরপত্র চাওয়া হবে, মূল্যায়ন হবে এবং সেই অস্ত্র সীমান্তে প্রহরারত সৈনিকদের হাতে কতদিনে পৌঁছবে তা ভবিষ্যতের গর্ভে চলে গেল। ততদিন ভারতীয় পদাতিককে ৫.৫৬ মিটার ইনসাস রাইফেল নিয়েই কাজ চালাতে হবে। ভারতীয় অর্ডিন্যান্স ফ্যাক্টরির এই রাইফেল সবসময় ঠিকমতো কাজ করে না। দেখার বিষয় মোদী সরকার এ বিষয়ে কী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

ভারতের সেনাবাহিনীর প্রতিরক্ষা ক্ষমতা বাড়াতে বর্তমান সরকার নজর দিচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রেই প্রগতি হয়েছে। তবে ওই বছরে ভ্রষ্টাচার, অনাচার, অর্থাভাব জর্জরিত অবস্থা অতিক্রম করে এর বেশি কিছু আশা করা সম্ভব নয়। আগামীদিনে আশা করা যায়, প্রতিরক্ষা বাহিনী প্রয়োজনীয় অস্ত্র-উপকরণ, বিমান, যুদ্ধজাহাজ, সাবমেরিন, হেলিকপ্টার সব কিছুই পাবে। মেক ইন ইন্ডিয়া প্রকল্প গতি পাবে।■

মোদী সরকারের একবছর

দিব্যজোতি চৌধুরী

গত লোকসভা নির্বাচন প্রচার পর্বে নরেন্দ্র মোদী যখন দেশজুড়ে উন্নয়নের মধ্যে দিয়ে তাঁর নতুন ভারত গড়ার ভাবনার কথা শোনাচ্ছিলেন, ঠিক সেই সময় রাজ্যে রাজ্যে মমতাদেবীর মতো আঞ্চলিক নেতৃত্বরা তাঁর বিরুদ্ধে ব্যক্তি-আক্রমণ ও অপপ্রচারে ব্যস্ত ছিলেন। ব্যাপারটা অসহনীয় পর্যায়ে পৌঁছলেও তিনি কিন্তু কখনোই পাল্টা ব্যক্তি-আক্রমণের রাস্তায় হাঁটেননি। বরং বিরোধীদের আহ্বান জানিয়েছিলেন— 'আসুন আমরা উন্নয়ন নিয়ে প্রতিযোগিতা করি। দেখা যাক কে জেতে!' তার পরের অধ্যায়টি আজ ইতিহাস।

তবে সংস্কারমুখী উন্নয়নের রাস্তা যতটা কঠিন বলে অনুমান করা গেছিল, বাস্তবে কিন্তু তার থেকেও অনেক বেশি কঠিন পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে হয়েছে এ সরকারকে গত এক বছরে। একদিকে চটজলদি অনেককিছু করে দেখানোর চাপ, অন্যদিকে সংস্কারের দীর্ঘমেয়াদি বন্ধুর পথ--- দুইয়ের মধ্যে ভারসাম্য রাখতে গিয়ে সরকারের কিছুটা অস্বস্তি দেখা গেছে। তবে সরকারকে অনেক বেশি বেগ দিয়েছে নজিরবিহীন বিরোধী ঐক্য। লোকসভা ভোটে ভরাডুবির পর আঞ্চলিক নেতারা দীর্ঘদিনের জাতশত্রুতা ভুলে এক ছাতার তলায় আসতে শুরু করেছে। রাজনীতিতে অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ার আগেই তাঁরা কংগ্রেসকে সঙ্গে নিয়ে চরম প্রত্যাঘাত করতে কোমর বেঁধে নেমে পড়েছেন। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে দিল্লী নির্বাচনে দলের হতাশাজনক ফল। এরকম বহুমুখী চাপের মুখে পড়ে প্রত্যাশিত যে ছন্দে কাজ শুরু করেছিল এ সরকার, পরের দিকে সেটার কিছুটা খামতি লক্ষ্য করা গেছে। তবুও পূর্বপ্রতিশ্রুতি মতো সরকার এক বছরের কাজের খতিয়ান তুলে ধরতে চায়। ইতিমধ্যেই প্রধানমন্ত্রী বিভিন্ন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীদের পারফরমেন্স রিপোর্ট তৈরির নির্দেশ দেবার পাশাপাশি, কী কী কাজ পড়ে আছে তার তালিকা তৈরি করে সেসবে জোর দিতে বলেছেন। সরকারের কাজের মূল্যায়নের ক্ষেত্রে যেটা সবচেয়ে বেশি জরুরি তা হলো সরকারের ঘোষিত নীতি এবং কর্মসূচির সঙ্গে তার পদক্ষেপ কতটা অনুসারী হতে পেরেছে তার পর্যালোচনা করা।

মানুষকে সরাসরি পাইয়ে দেবার বদলে এ সরকার পরিকাঠামো নির্মাণ করে আর্থিক বৃদ্ধির পথ সুগম করতে চেয়েছে এবং তার সুফল সমাজের সর্বস্তরে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করতে চেয়েছে। গতানুগতিক পথে আইন করে খাবার, কাজ এসব পাইয়ে দেবার প্রথা থেকে বের করে এনে গরিবদের আর্থিকভাবে সবল করার পাশাপাশি সামাজিক সুরক্ষা দিয়ে সক্ষম করতে চেয়েছে।

অর্থনীতি

আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার বলছে যে, ২০১৬ সালে ভারতীয় অর্থনীতির বৃদ্ধির হার চীনকেও ছাড়িয়ে যাবে। ভারতের বৃদ্ধির হার হবে ৬.৫ শতাংশ, যেখানে চীনের হবে ৬.৩ শতাংশ। চীনের আর্থিক সংস্কারের প্রক্রিয়াটি ভারতের দশ বছর আগে শুরু হয়েছিল। সেই হিসেবে ভারত আজ সেই পর্যায়ে আছে, চীন দশ বছর আগে যেখানে ছিল। ২০০৫ সালের চীনের তুলনায় ২০১৫ সালের ভারত সামান্য হলেও এগিয়ে আছে এ তথ্যটা কিন্তু উৎসাহব্যঞ্জক। তবে চীনকে ছুঁতে হলে ভারতের বৃদ্ধির হার ধারবাহিকভাবে দশ শতাংশের উপরে থাকা প্রয়োজন। তার জন্য ভারতকে নির্মাণ ক্ষেত্রের দিকে নজর দিতে হবে। সংস্কার পরবর্তী ভারত মূলত পরিষেবা রপ্তানির উপর নির্ভরশীল ছিল। নির্মাণ ক্ষেত্রে উৎপাদনশীলতা বাড়ানো তুলনায় সহজ।

ভারতের ক্ষেত্রে কথাটা আরও বেশি সত্য। কারণ ভারতের উৎপাদনশীলতা যথেষ্ট কম। দেশের বাহ্যিক পরিকাঠামোর উন্নতি প্রয়োজন। আর প্রয়োজন সঞ্চয় ও বিনিয়োগের হার বাড়ানো। এই পরিস্থিতিতে অর্থমন্ত্রী পরিকাঠামো উন্নয়নখাতে গতবারের চেয়ে ৭০ হাজার কোটি টাকা বেশি বরাদ্দ করেছেন। পরিকাঠামোয় সরকারি-বেসরকারি লগ্নি বাড়াতে ১০০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। রেল, সড়ক, সেচ বিভাগের ক্ষেত্রে পরিকাঠামো বন্ড করমুক্ত করা হয়েছে। দেশে ৫টি 'আল্ট্রামেগাপাওয়ার' প্রকল্পে ১ লক্ষ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। জোর দেওয়া হয়েছে দেশের বন্দরগুলির উন্নয়নের উপরেও। সম্পদ কর তুলে দিয়ে এবং কোম্পানি করের বোঝা কমিয়ে যেমন বড় শিল্পে বিনিয়োগকারীদের উৎসাহ দেওয়া হয়েছে, তেমনি ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের প্রসারে ২০ হাজার কোটি টাকা 'মুদ্রাব্যাঙ্ক' খুলে ঋণদানের পথ প্রশস্ত করা হয়েছে যাতে উপকৃত হবে দেশের কমবেশি ৫ কোটি ক্ষুদ্র শিল্প। বিশেষজ্ঞ কমিটি গড়ে শিল্পে বিভিন্ন ছাড়পত্র জোগাড়ের প্রক্রিয়াকে সরল করা হয়েছে। বিদেশি সংস্থার সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে ভারতীয় সংস্থাগুলি যাতে অস্ত্রশস্ত্র তৈরি করে রপ্তানিও করতে পারে তার জন্য বিপুল বরাদ্দ করা হয়েছে। তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পকেও বিশ্বমানের করার লক্ষ্যে প্রচুর বিনিয়োগ করা হয়েছে। বিভিন্ন দেশে ঘুরে প্রধানমন্ত্রী অনাবাসী ভারতীয়দের দেশে লগ্নি করার আহ্বান করেছেন। এই মর্মে ১৫০টি দেশের ভিসার সরলীকরণ করা হয়েছে। অনুরূপ বহু পদক্ষেপ নিয়ে সরকার অর্থনীতিকে নির্মাণ-বিনিয়োগমুখী করার লক্ষ্যে যা যা দরকার তার খামতি রাখেনি। চলতি অর্থবর্ষের প্রথম তিন মাসেই আর্থিক বৃদ্ধি হয়েছে ৫.৭ শতাংশ যা বিগত ৯ বছরে সর্বোচ্চ। সরকার আশাবাদী যে এই বৃদ্ধি ২০১৫-১৬ সালের শেষে ৮ শতাংশকেও ছাড়িয়ে যাবে। স্বাভাবিকভাবেই গত এক বছরে মোদী যে পথে চলেছেন তার অভিমুখ যথার্থ ও প্রশ্নাতীত।

ধুঁকতে থাকা ভারতীয় অর্থনীতিকে এক বছরের মধ্যে তিনি যে শুধু চাঙ্গা করে তুলেছেন তাই নয়, তার পুরানো রোগের কারণগুলিও নির্মূল করার চেষ্টা করেছেন। শতচেষ্টা করেও বিগত ইউপিএ সরকার মূল্যবৃদ্ধি কমাতে ব্যর্থ হয়েছে। অথচ মোদী সরকার কিছু কড়া পদক্ষেপ যেমন প্রশাসনিক খরচ ও ভরতুকি কমানো, সোনা ও অত্যাবশ্যকীয় নয় এমন ভোগ্যপণ্যের আমদানি হ্রাস, উৎপাদনশীলতা ও রপ্তানি বাড়ানো, খাদ্যপণ্যের মজুতদারি, কালোবাজারি ও রপ্তানি ঠেকানো এরকম ব্যবস্থা নিয়ে খুব কম সময়ে পাইকারি মূল্যবৃদ্ধি অবিশ্বাস্যভাবে কমিয়েছেন। খুচরো মূল্যবৃদ্ধিও ৫ শতাংশের নীচে নেমে গেছে। আইনগত জটিলতায় যদিও এখন পর্যন্ত কালোটাকা দেশে ফেরাতে পারেনি সরকার, তবুও ভবিষ্যতে যাতে আর কোনো কালোটাকা বিদেশে না যায় তার জন্য কঠোর আইন করেছে। মনোমোহন জমানায় বিদেশি বিনিয়োগকারীরা ভারতের বাজার থেকে বিনিয়োগ প্রত্যাহার করার পাশাপাশি বিনিয়োগের গন্তব্য হিসেবে ভারতের অবস্থান নেতিবাচক পর্যায়ে নেমে গেছিল। অথচ এক বছরের মধ্যেই এই ছবিটা আমূল বদলে দিয়েছেন নরেন্দ্র মোদী। তাঁর 'মেক ইন ইন্ডিয়া'-র ভাবনা বিশেষ এতটাই আলোড়ন তুলেছে যে বিশ্বে তাবড় শিল্পোন্নত দেশগুলির বিনিয়োগের প্রথম পছন্দের স্থান হয়ে উঠেছে ভারত। জাপানে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী ৩৫ ডলার বিলিয়ন জাপানি বিনিয়োগের চুক্তি সই করেছেন যা এর আগে কোনো প্রধানমন্ত্রী করতে পারেননি। জার্মানির গাড়ি নির্মাতারা যে শুধু ভারতে লগ্নি করতে চাইছে তাই নয়, প্রয়োজনীয় যন্ত্রাংশও তারা ভারত থেকেই কিনবে। আমেরিকার সামরিক ও যুদ্ধাস্ত্র নির্মাতারা দেশীয় শিল্পপতিদের সঙ্গে যৌথভাবে ৭০০ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগের চুক্তি করেছে। অনুরূপ ৪৬টি সামরিক, যুদ্ধাস্ত্র, যুদ্ধাস্ত্র বহনকারী যানবাহনের মতো বিষয়ে ছাড়পত্র দিয়েছে ভারত সরকার। জাপানি বাইক সংস্থা ভারতে তাদের উৎপাদনক্ষমতা ৪০ শতাংশ বাড়িয়ে ভারতকে বিশ্বের বৃহত্তম মোটর বাইক উৎপাদনকারী দেশ করে তুলতে চায়। চীনও ভারতের সঙ্গে ১০০০ কোটি ডলার বিনিয়োগ চুক্তি করতে চলেছে। 'মেক ইন ইন্ডিয়া' কর্মসূচিকে সফল করতে 'শ্রমেব জয়তে'-র মাধ্যমে শ্রমিক কল্যাণে সরকার একগুচ্ছ সংস্কার এনেছে। জটিল শ্রমবিধির জমানা বদলে দিয়ে সরকার শিল্পপতিদের আস্থা অর্জন করেছে। যুব সমাজের কর্মসংস্থান বাড়ানোর লক্ষ্যে গড়া হয়েছে জাতীয় দক্ষতা মিশন। ২০১৪-১৫ অর্থবর্ষের প্রথম তিন মাসেই কর্মসংস্থান বেড়েছে ১০.৪ শতাংশ হারে। 'গ্লোল্ডমানি টাইজেশন স্কিম' নামে সরকার আরও একটি যুগান্তকারী যোজনা এনেছে। সোনা কিনলে তা কোথায় রাখা হবে ভেবে যেখানে মানুষের কালঘাম ছুটে যেত, সেই সোনা এখন ব্যাঙ্কে রাখা যাবে ডিপোজিট হিসেবে। বছর শেষে সুদ হিসেবে মিলেব আরও খানিকটা সোনা। ব্যাঙ্কও সেই সোনা কমসুদে সোনার ব্যবসায়ীদের ধার দিতে পারবে। লাভবান হবে ব্যাঙ্কও। ব্যবসায়ীরা বাজারের থেকে কম সুদে সোনা পাবে যাতে উৎসাহিত হবে স্বর্ণশিল্প। এই শিল্পে প্রচুর কাজের সুযোগ বাড়বে। বছরে ভারতকে ৮০০ থেকে ১০০০ টন সোনা আমদানি করতে হয়। এই প্রকল্পে ৩০ শতাংশ আমদানি কমানো যাবে যাতে বিপুল বিদেশি মুদ্রার খরচ বাঁচবে আর লেনদেন ঘাটতিও কমে যাবে। এদেশে মহিলারা তো বটেই, মন্দিরগুলি যে বিপুল সোনা জমিয়ে রাখে তার পরিমাণ ২০ হাজার টন যা লকারে বা মাটির নীচে পোঁতা থাকে। এই প্রথম সোনাকে বিনিয়োগ করার কথা ভাবা হয়েছে যা বাস্তবে সম্ভব হলে, অর্থনীতির চিত্রটাই আমূল বদলে যাবে।

আম-আদমির জন্য

এবার দেখে নেওয়া যাক গরিব, কৃষক এবং আম-আদমির জন্য এক বছরে কী করা হয়েছে। এ সরকার গরিবদের আর্থিক ও সামাজিক ভাবে সুরক্ষিত করতে চেয়েছে। সে লক্ষ্যে প্রথমেই যে প্রকল্প নেওয়া হয়েছে তা হলো প্রধানমন্ত্রী জনধন যোজনা। এখন যাঁরা ব্যাঙ্কিং পরিষেবা থেকে বঞ্চিত তাঁদেরকে বিনা আমানতে এবং সুলভ শর্তে খাতা খোলার সুবিধে দেওয়া হয়েছে। অতিরিক্ত সুবিধা হিসেবে দেওয়া হয়েছে বিনামূল্যে ৩০ হাজার টাকার সাধারণ বিমা ও ১ লক্ষ টাকা দুর্ঘটনা বিমা। আরও থাকছে ৫ হাজার পর্যন্ত জমাতিরিক্ত উত্তোলন এবং ডেবিট কার্ডের সুবিধা। এই যোজনায় দেশজুড়ে অভূতপূর্ব সাড়া পাবার পাশাপাশি সমাজবিদরা স্বাধীন ভারতে এযাবৎ গরিবদের জন্য যত প্রকল্প নেওয়া হয়েছে তার মধ্যে এটিকে সেরা বলে মনে করছেন। গরিব ও অসংগঠিত ক্ষেত্রের মানুষকে সামাজিক সুরক্ষা দিতে 'প্রধানমন্ত্রী সুরক্ষা বিমার' মাধ্যমে বছরে মাত্র ১২ টাকার বিনিময়ে ২ লক্ষ টাকার দুর্ঘটনা বিমা চালু করা

হয়েছে। মৃত্যুতে, এমনকী দুটি অঙ্গহানিতেও মিলবে ২ লক্ষ টাকা। একটি অঙ্গ হানিতে মিলবে এক লক্ষ টাকা। ১৮ থেকে ৭০ বছরের মধ্যে যে কেউ এর সুবিধা নিতে পারবেন। প্রধানমন্ত্রী জীবনজ্যোতি বিমা যোজনায় ১৮-৫০ বছরের মধ্যে যে কেউ বছরে ৩৩০ টাকা প্রিমিয়ামের বিনিময়ে ২ লক্ষ টাকার সাধারণ বিমার সুবিধা পাবেন। মৃত্যুতে, এমনকী আত্মহত্যাতেও এই বিমাকৃত রাশি পাওয়া যাবে। যাঁরা পেনশন থেকে বঞ্চিত, তাঁরা তাঁদের ১৮ থেকে ৪০ বছর বয়সের মধ্যে 'অটল পেনশন যোজনা'র মাধ্যমে টাকা জমাতে পারবেন। সরকার ৫০ শতাংশ হিসেবে মাসে ১০০০ টাকা পর্যন্ত এই যোজনায় দান করবেন। এতে ৬০ বছর বয়স থেকে ১০০০ থেকে ৫০০০ পর্যন্ত মাসিক পেনশন পাবে গ্রাহকরা। স্বাস্থ্য বিমাতেও করছাড়ের সুবিধা বাড়ানো হয়েছে। 'প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সঞ্চয় যোজনা'-য় যাতে কৃষকরা সেচের কাজে পূর্ণ সহায়তা পান তাও নিশ্চিত করেছেন তিনি। ২৫ হাজার কোটি টাকার গ্রামীণ উন্নয়ন কাণ্ড তৈরির পাশাপাশি ১৫ হাজার কোটি টাকার দীর্ঘমেয়াদি কৃষিঋণ, ৪৫ হাজার কোটি টাকার স্বল্পমেয়াদি কৃষিঋণ ইত্যাদি মিলিয়ে ৮ লক্ষ কোটি টাকার ঋণ দেওয়া হবে ২০১৫-১৬ সালে। জাতীয় কৃষিপণ্যের বাজারের জন্য ৫ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে যাতে কৃষিপণ্যের বিপণনে অপচয় বন্ধ হয়ে খাদ্যশস্যের দাম না বাড়ে। কৃষকরা সময়মতো ঋণ শোধ করতে পারলে বর্তমান ৭ শতাংশ সুদ থেকে ছাড় মিলবে ৩ শতাংশ। 'প্রধানমন্ত্রী কৃষি সিঞ্চয়ি যোজনা'য় ১০০০ কোটি টাকার সেচ ঋণ দেওয়া হচ্ছে। ১০০ কোটি টাকা ব্যয়ে অসম ও ঝাড়খণ্ডে 'পুষ্প' নামে কৃষি গবেষণাগারের পাশাপাশি অন্ধ্র ও রাজস্থানে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এবং তেলেঙ্গানা ও হরিয়ানায় উদ্যান বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তোলা হচ্ছে। কৃষকদের আর অভাবী বিক্রি করতে হবে না। ১০০ কোটি টাকা ব্যয়ে 'কিষাণটিভি' চালু হচ্ছে যা কৃষককে খাদ্যশস্যের বাজার দাম, আবহাওয়া ইত্যাদি বিষয়ে খবরাখবর দেবে। প্রাকৃতিক দুর্যোগে শস্যহানি হলে সরকারি ক্ষতিপূরণের মাত্রা এক তৃতীয়াংশ থেকে অর্ধেক করা হয়েছে যা স্বাধীনভারতে কৃষিকল্যাণে সবচেয়ে বড় একটি পদক্ষেপ। শস্যের নিম্নমানের জন্য এই ছাড় ৫০ শতাংশ পর্যন্ত করা হয়েছে। উন্নয়ন ও জাতীয় স্বার্থে কৃষিজমি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণের মাত্রা ৫০ শতাংশ বাড়ানো হয়েছে। কৃষি উৎপাদন বাড়াতে গিয়ে যাতে জমির উর্বরতা নষ্ট না হয় তার জন্য সরকার বিশেষ ভাবনা-চিন্তা করেছে। আগামী তিন বছরে ১৪ কোটি কৃষকের জমি পরীক্ষা করা হবে যাতে প্রয়োজনের অতিরিক্ত সার ও সেচ ব্যবহার না করা হয় এবং কোন জমি কোন ফসলের উপযুক্ত তা নির্ণয় করা যায়। 'সয়েল হেলথ কার্ড' ব্যবহার করে প্রতি তিন একরে ৫০ হাজার টাকা খরচ বাঁচাতে পারবেন কৃষকরা। ইপিএফ এবং পিপিএফ-এ পড়ে থাকা দাবিহীন ৯ হাজার কোটি টাকা দিয়ে দারিদ্র্যসীমার নিচে বৃদ্ধ, ছোট ও প্রান্তিক চাষির জন্য প্রবীণ নাগরিক কল্যাণ তহবিল গড়া হয়েছে।

অনগ্রসর শ্রেণীর জন্য

তপশিলিজাতি, উপজাতি, অনগ্রসর শ্রেণীর প্রকৃত উন্নয়নে একগুচ্ছ প্রকল্প আনা হয়েছে গত এক বছরে। ২০১৪-১৫ সালে এজন্য ১০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। উপজাতি ছাত্রছাত্রীদের জন্য হস্টেল, আশ্রম বিদ্যালয়, মাধ্যমিক উত্তর বৃত্তি চালু করা হয়েছে। সংবিধানের ২৭৫ (১) ধারা অনুযায়ী উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অনগ্রসরদের বিশেষ সহায়তা দেবে কেন্দ্র। বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান, এনজিও প্রভৃতিকে উপজাতি এলাকায় শিক্ষার প্রসারে ইতিমধ্যেই ৮২,১০,৬২০ টাকা দেওয়া হয়েছে। ইউপিএ আমলে ২০১৩-১৪ সালে যেখানে উপজাতি সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ইত্যাদি বাঁচাতে মাত্র ২৭৩.৬৯ লক্ষ টাকা অনুমোদন করা হয়েছিল সেখানে এবার উপজাতি গবেষণা প্রতিষ্ঠানকে ২৫,৫২৫.২৬ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও অনগ্রসর শ্রেণীর ব্যবসায়ী ও মহিলা কল্যাণে বিপুল খরচ ঘোষণা করা হয়েছে। শুধুমাত্র প্রকল্প ঘোষণা করাই নয়, প্রতিটি গ্রামের নিজ নিজ সমস্যা ও সম্ভাবনা বিচার করে তার উন্নয়ন করে আদর্শ গ্রাম গড়ে তোলার লক্ষ্যে 'সাংসদ আদর্শ গ্রাম' প্রকল্প নেওয়া হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নিজে একটি গ্রাম দত্তক নিয়ে অন্যান্য সাংসদকেও আহ্বান করেছেন অন্তত একটি করে গ্রাম দত্তক নিতে। স্বাধীনতার ৭৫ বছর উপলক্ষে তিনি সমস্ত গৃহহীনদের বাড়ি উপহার দিতে চান। দুর্বলশ্রেণী, শহরের বস্তিবাসী ও গৃহহীন, ছোট শহর ও শহরতলির গৃহহীনদের 'সবার জন্য বাড়ি প্রকল্প-এ' ২০২২ সালের মধ্যে ২ কোটি আবাস তৈরির লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। রান্নার গ্যাসের ভরতুকি সরাসরি গ্রাহকদের অ্যাকাউন্টে পৌঁছে দিয়ে সরকার রান্নার গ্যাসের দুর্নীতিও অপচয় বন্ধ করেছেন।

সমাজ সংস্কার

সমাজ সংস্কারেও এ সরকার এক বছরে বহু কাজ করেছে। মহাত্মা গান্ধীর ১৫০ তম জন্মবার্ষিকীতে যাতে স্বচ্ছ ভারত উপহার দেওয়া যায় সেই লক্ষ্যে সরকার চালু করেছে স্বচ্ছ ভারত অভিযান। নিজের বাসভবন জঞ্জালমুক্ত করে, দেশবাসীকেও আবেদন করেছেন যাতে প্রত্যেকে বছরে এই লক্ষ্যে অন্তত ১০০ ঘণ্টা সময় দেন। শচীন তেণ্ডুলকর, বাবা রামদেব, অনিল আম্বানিদের মতো বিশিষ্ট নয় জনকে সামিল করা হয়েছে এই প্রকল্প সফল করতে। এই অভিধানের অঙ্গ হিসেবে দেশজুড়ে শৌচাগার তৈরির প্রকল্পও নেওয়া হয়েছে। সরকার এ বিষয়ে জনচেতনা জাগানোর জন্য লাগাতার প্রচার অভিযান চালিয়ে আসছে। এই অভিযান শুধু নাগরিকদের পরিচ্ছন্নতার সুঅভ্যাসই গড়ে তুলবে না, রাষ্ট্রের মুখ উজ্জ্বল করার পাশাপাশি ভারতকে পর্যটনের উপযুক্ত গন্তব্য করে তুলবে। প্রতিরক্ষা বাহিনীর ২০ লক্ষ অবসরপ্রাপ্ত কর্মীদের দীর্ঘদিনের দাবি মেনে সরকার চালু করেছে একপদ ও এক সময়ের কর্মজীবনের জন্য সমান পেনশন।

সড়কপথে পরিবহন ব্যবস্থাকে আমূল বদলে দেবার লক্ষ্যে ২০১৪-১৫ অর্থবর্ষে সড়ক নির্মাণে ২৮,৮৮১ কোটি এবং ২০১৫-১৬ অর্থবর্ষের জন্য ৪২,৯২২ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। প্রথম আট মাসে ১৫টি নতুন প্রকল্পে ১৬৭৮.২১ কিলোমিটার রাস্তা বানাতে প্রতিদিন গড়ে ৩০ কিলোমিটার রাস্তা বানানোর লক্ষ্য রাখা হয়েছে। ১০টি প্রকল্পে ইতিমধ্যেই ১০০০ কিলোমিটার রাস্তা বানানো হয়েছে। তামাক বর্জনের লক্ষ্যে তামাক জাতীয় দ্রব্যের বিপণনে কড়া আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। নাবালকদের মধ্যে অপরাধ প্রবণতা কমানোর লক্ষ্যে সরকার পাশ করেছে জুভেনাইল বিল। কন্যাভ্রূণ হত্যার মতো সামাজিক অভিশাপের হাত থেকে সমাজকে রক্ষা করতে সরকার মানসিকতা

বদলের আহ্বান জানিয়েছেন। 'বেটি বাঁচাও, বেটি পড়াও' অভিযানের মধ্যে দিয়ে সরকার প্রচার করছে যে কন্যারা আর মা-বাবার বোঝা নয়। 'সুকন্যা সমৃদ্ধি যোজনা'য় দশ বছর পর্যন্ত বয়সের কন্যার পিতামাতারা টাকা জমিয়ে সর্বোচ্চ হারে (বার্ষিক ৯.২ শতাংশ) সুদ পাবেন। ওই জমা টাকা কন্যার বিয়ে অথবা ২১ বছর পর্যন্ত চলবে, পাওয়া যাবে আয়করের সুবিধা। পরিবেশ রক্ষা করতে সরকার সদিচ্ছা দেখিয়েছে। 'নমামি গঙ্গে' প্রকল্পে ১৮ বছরে গঙ্গার ২৫০০ কিলোমিটার গতিপথকে দূষণমুক্ত করতে ২০১৪-১৫ সালে প্রাথমিকভাবে ২০ হাজার কোটি টাকা অনুমোদন করেছে সরকার। সবুজ বাড়াতে ৩৫ হাজার কোটি টাকা রাজ্যগুলিকে দেবে কেন্দ্র। প্রাকৃতিক সম্পদের সংরক্ষণ করতে বিদ্যুতের সাশ্রয় করতে হবে। ২০১৬-র মার্চের মধ্যে সমস্ত ঘরে এলইডি বাল্বের ব্যবহার করানো এবং দেশের ১০০টি শহরের রাস্তার আলো এলইডি আলোয় বদলে দেওয়া হবে। ভারতীয় রেল দেশের সিংহভাগ শক্তিসম্পদের গ্রাহক। জ্বালানি তেল ও বিদ্যুতের বিকল্প হিসেবে সৌরশক্তিকে ভাবা হয়েছে। রেলের অন্তত ২০ শতাংশ বিদ্যুৎ যাতে সৌরশক্তি থেকে আসে তার জন্য ৪ হাজার কোটি টাকা খরচ করা হবে। এতে বছরে ৯ হাজার কোটি টাকা সাশ্রয় হবে। জ্বালানি তেলের ৫ শতাংশ আসবে বায়োডিজেল থেকে। এসব করতে ২ থেকে ৩ বছর সময় লাগবে।

প্রশাসনিক সংস্কার

দেশকে দুর্নীতিমুক্ত স্বচ্ছ প্রশাসন দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী। ক্ষমতায় আসার ৬০ দিনের মাথায় কেন্দ্রীয় সরকার একটি ওয়েবসাইট চালু করেছেন যার মাধ্যমে দেশের সাধারণ মানুষ প্রশাসন ও দুর্নীতি নিয়ে মতামত জানাতে পারবেন। এর আগে এই জরুরি কাজটি দেশের কোনো প্রধানমন্ত্রী করেননি। সারা দেশের হাইকোর্ট ও সুপ্রিমকোর্টের বিচারপতি নিয়োগে স্বচ্ছতা নেই। স্বাধীনতার পর কেন্দ্রের কোনো সরকারই দ্রুত বিচারপতি নিয়োগ করে বকেয়া মামলার নিষ্পত্তির কথা ভাবেনি। মোদীজী ভেবেছেন এবং বিচারপতি নিয়োগের জন্য সংসদে 'ন্যাশনাল জুডিশিয়াল অ্যাপয়েন্টমেন্টস্ কমিশন বিল ২০১৪' ধ্বনি ভোটে পাশ করিয়ে নিয়েছেন। সরকারের অন্দরে থাকা পাওয়ার ব্রোকারদের ক্ষমতা খর্ব করেছেন। মোদীজীই দেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী যিনি সরকারের টাকায় মন্ত্রীদের নিজের ব্যবহারের জন্য গাড়ি কেনার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছেন। এমনকী মন্ত্রীদের নিজের দপ্তরের খরচের সীমা বছরে ১ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বেঁধে দিয়েছেন। সংসদে দুর্নীতি-বিরোধী বিল পেশ করেছেন। মন্ত্রী-আমলাদের ভরতুকিযুক্ত গ্যাস সিলিন্ডার ছাড়তে আহ্বান জানিয়েছেন। তবে সবচেয়ে বড় প্রশাসনিক সংস্কারটি হলো নীতিআয়োগ গঠন করা, দেশের উন্নয়নে রাজ্যগুলিকে সামিল করতে প্রকল্প ঘোষণা ও তার রূপায়ণে রাজ্যগুলিকে অনেক বেশি স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে। সমস্ত রাজ্যের প্রতিনিধিদের নিয়ে গড়া নীতি আয়োগ যুক্তরাষ্ট্রীয় গণতন্ত্রের বাস্তব রূপ দিয়েছে।

আর্থিক সংস্কার

আর্থিক সংস্কারের লক্ষ্যে বেশ কিছু বিল লোকসভায় পাশ করেছে সরকার। খনিজ সম্পদ বণ্টনে স্বচ্ছতা আনতে পাশ করানো হয়েছে কয়লা বণ্টন ও খনিজ বিল। খনির পুনর্বণ্টনের মাধ্যমে সরকারের আয় বিপুলভাবে বেড়েছে। দীর্ঘ টালবাহানার পর পাশ হয়েছে বিমা বিল। ভারতের আর্থিক সংস্কারের ইতিহাসে এই বিলটির তাৎপর্য অপরিসীম। কেননা এই ক্ষেত্রের মাধ্যমে বিদেশি বিনিয়োগ বাড়লে একদিকে যেমন অর্থনীতি চাঙ্গা হবে, তেমনি শিক্ষিত বেকার ছেলেমেয়েরা জীবিকা নির্বাহের হাতিয়ার খুঁজে পাবে। উৎপাদিত পণ্য ও পরিষেবাকে বিভিন্ন পর্যায়ে কর দিতে হয়। এবার পণ্য ও পরিষেবা বিল এনে তার অবসান ঘটিয়ে যুক্তমূল্য কর চালু হলো, যাতে লাভবান হবেন ক্রেতারা। কালোটাকার উৎস খুঁজতে মোদীজী একটি বিশেষ তদন্তকারী দল (সিট) গঠন করেছেন যার প্রাথমিক রিপোর্ট অনুসারে খনি ও বহুতল আবাসন নির্মাণ ব্যবসা কালোটাকার প্রধান দুটি উৎস। আবাসন ব্যবসায় দুর্নীতিরোধে পাশ করানো হয়েছে আবাসন বিল।

বিদেশনীতি

অতি অল্প সময়েই মোদীজী ভারতের দিশাহীন বিদেশ-নীতিতেও বিরাট পরিবর্তন

এনেছেন। তাঁর দ্বিধাহীন বিদেশ-নীতি বিশ্বের তাবড় শক্তিশালী রাষ্ট্রকেও চমৎকৃত করেছে। তিনি বলেছেন যে ভারত যদি প্রতিমনোযোগী হয়, তবে তাদের মনোভাবও ভারতের প্রতি অনুকূল হবে। বাংলাদেশের সঙ্গে ঐতিহাসিক স্থলসীমান্ত চুক্তি করে তিনি প্রতিবেশীর অকুণ্ঠ সমর্থন আর সমীহ আদায় করেছেন। সাম্প্রতিক ভূমিকম্পে বিধ্বস্ত নেপালের পুনর্গঠনে তাঁর ভূমিকা বিশেষ প্রশংসার দাবি রাখে। নেপাল, ভুটান, জাপান-সহ এশিয়ার বিভিন্ন দেশের সঙ্গে সুসম্পর্ক স্থাপন করে ভারত এশিয়ার অন্যতম বৃহৎশক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। কারগিলে ছায়াযুদ্ধ বন্ধ করার কড়াবার্তা দিয়ে প্রধানমন্ত্রী বুঝিয়ে দিয়েছেন যে ভারত পাকিস্তানকে আর বিশেষ ছাড় দেবে না। নয়াদিল্লী বরাবরই মহাসাগরে নিজের অবস্থান সুদৃঢ় করতে উদাসীন থেকেছে। মোদীজী দুই বৃহৎ শক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চীন উভয়কেই বার্তা দিয়েছেন যে ভারত মহাসাগর শুধু তার নামাঙ্কনের জন্য নয়, ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিকভাবেও ভারতকে ঘিরেই আবর্তিত হবে। সম্প্রতি তিনি সেসলস, মরিশাস, শ্রীলঙ্কার মতো দ্বীপরাষ্ট্রগুলিতে সফর করে তাদের ভারতের নিরাপত্তা ছাতার তলায় আশ্রয় দিয়ে আশ্বস্ত করেছেন। জার্মানি, অস্ট্রেলিয়ার মতো দেশও ভারতকে এশিয়ার সুস্থিতি বজায় রাখতে বিশেষ অনুকূল শক্তি মনে করছে। চীনের সামরিক শক্তি বৃদ্ধি ও আগ্রাসী মনোভাব এশিয়ার নানা দেশে আতঙ্ক সৃষ্টি করেছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে ভারতও তার সামরিক শক্তি বাড়িয়ে এবং মহাকাশ যান প্রেরণ করে তার সবল উপস্থিতি জানান দিয়েছে। জাপানের সঙ্গে ভারতের সখ্য বাড়িয়ে তিনি চীনকে এতটাই চাপে ফেলেছেন যে তারা ভারতের সঙ্গে সুসম্পর্ক বাড়াতে ব্যগ্র হয়ে উঠেছে। নেহরু জামানায় চীনের সঙ্গে ভারতের অশ্বডিম্ব প্রসবকারী দ্বিপাক্ষিক চুক্তি 'পঞ্চশীল'-কে পাল্টে তিনি 'পঞ্চামৃত' নীতির অবতারণা করেছেন, যাতে ভারতের অগ্রাধিকার প্রাধান্য পাবে। ভারতে চীনের রাষ্ট্রপতির সফর এবং মোদীজীর সাম্প্রতিক চীন সফর দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যিক ও কৌশলগত দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে চলেছে। এবার নিজের শর্তেই বৃহৎশক্তিধর প্রতিবেশীর কাছ থেকে যতটা সম্ভব লাভ আদায় করে নিতে চান মোদী। এতদিন চীনের আপত্তিতেই রাষ্ট্রপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদে স্থায়ী সদস্য পদ পায়নি ভারত। এবার চীনকে দিয়েই মোদীজী ঘুরিয়ে বলাতে চলেছেন যে, চীন ভারতকে নিরাপত্তা পরিষদে 'বৃহত্তর ভূমিকায়' দেখতে চায়। চীন, পাকিস্তান প্রভৃতি সীমান্তে নজরদারি বাড়াতে ও জঙ্গি অনুপ্রবেশ রুখতে সড়ক নির্মাণ ও উন্নত প্রযুক্তির যন্ত্র বসানোর কাজ শুরু হয়ে গেছে। তাই একজন প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তাঁর কূটনৈতিক দক্ষতা অদৃষ্টপূর্ব ও প্রশ্নাতীত। বিশ্বের বুকে ভারতকে একটি সুশাসিত রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে সরকার 'ডিজিটাল ইন্ডিয়া প্রজেক্ট'-এ প্রাথমিকভাবে ১ লক্ষ কোটি টাকা মঞ্জুর করেছে। এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য হল নাগরিকরা যাতে সমস্ত সরকারি পরিষেবা বৈদ্যুতিন মাধ্যমে পেতে পারে এবং নথিপত্র সংক্রান্ত কাজকর্ম কম করা যায়। এর উল্লেখ্যযোগ্য দিক হলো গ্রামাঞ্চলে এমনকী মফস্সল এলাকাতেও উচ্চগতির ইন্টারনেট পরিষেবা দেওয়া। ২০১৯ সাল নাগাদ কাজ সম্পন্ন হবে। মোদীজীর মতে ভারতের মেধা তথ্যপ্রযুক্তির সঙ্গে যুক্ত হলে দেশের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হবে। এবার থেকে সরকারি কাজের জন্য গ্রামের মানুষকে আর শহরে সরকারি দপ্তরে আসতে হবে না। ইন্টারনেট পরিষেবায় সকল নাগরিকের সমানাধিকার সুনিশ্চিত হচ্ছে। এককথায়, মোদীজীর হাত ধরে ভারত আজ উন্নয়নশীল দেশের তকমা ঝেড়ে ফেলে উন্নত দুনিয়ার পথে চলেছে।

তবে এই একটা বছরে তিনি দলের অন্দরে-বাইরে যথেষ্ট সমালোচিত হয়েছেন। তাঁর সরকার বিভিন্ন সংস্কার বিল পাশ করাতে বিরোধীদের সম্মিলিত চাপের মুখে রীতিমতো নাস্তানাবুদ হয়েছেন। জমি অধিগ্রহণ বিল নিয়ে বিরোধীদের অনড় মনোভাব তাঁকে বেশ বেকায়দায় ফেলেছে। বিশেষত প্রধানমন্ত্রী যখন নিজে কৃষক ও জমির মালিকদের আশ্বস্ত করেছেন যে এতে কৃষকের কোনো ক্ষতি হবে না, বরং উপকার হবে এবং সরকার জাতীয় স্বার্থে ন্যূনতম জমিই অধিগ্রহণ করবে, তখন বিরোধীরা লাগাতার অপপ্রচার চালিয়ে সরকারের গায়ে কৃষক-বিরোধী তকমা লাগাতে চাইছে। এমনকী যখন বিভিন্ন সমীক্ষা বলছে যে, সরকারকে যে পরিমাণ জমি নিতে হবে তাতে কৃষি উৎপাদন কমার কোনো সম্ভাবনা নেই, সেসময় বিরোধীদের এরকম মনোভাবের পেছনে বিশেষজ্ঞরা ক্ষুদ্র রাজনৈতিক স্বার্থ ছাড়া কিছুই দেখছেন না। ভারতীয় রাজনীতিতে জমি আন্দোলন বরাবরই একটি লোভনীয় বিষয়, যা অতীতে বহু দলকে ক্ষমতায় বসিয়েছে। তাই লোকসভা ভোটে জনপ্রিয়তা হারানো দলগুলি এই ছুতোয় কিছুটা জমসমর্থন ফিরে পেতে চাইছে। তাছাড়া অধিগৃহীত জমিতে উন্নয়ন ঘটিয়ে মোদীজী যদি গরিবদের উন্নত জীবনের স্বাদ দিতে পারেন তবে তো বিরোধীরা রাজনীতিতে তাদের প্রাসঙ্গিকতা একেবারেই হারিয়ে ফেলবেন!

তবে শুধুমাত্র উন্নয়ন দিয়ে যদি তাঁর মূল্যায়ন করা হয় তবে সে বিচার খণ্ডিতই থেকে যাবে। সবকিছু থাকা সত্ত্বেও, শুধুমাত্র একটি বলিষ্ঠ নেতৃত্বের অভাবে দেশ যখন আত্মবিশ্বাসহীনতায় ভুগছিল, সে সময় তিনি রাষ্ট্রহিতকারী সুশাসনের আশ্বাসে দেশকে চনমনে করে তুলেছেন। নেহরুর পথে অক্ষম বিদেশি অনুকরণে তিনি দেশকে চালাতে চাননি। বরং উন্নত দুনিয়ার ফলপ্রসূ-নীতিগুলিকে পর্যালোচনা করে, তিনি সেগুলিকে ভারতের মাটিতে প্রয়োগের উপযুক্ত করেছেন। তাঁর ঘোষিত প্রতিটি প্রকল্পই সুদূরপ্রসারী ও বহুমুখী উদ্দেশ্য সাধনকারী। তবে সবেমাত্র তিনি দেশকে 'উন্নত ভারত'-এর পথে নিয়ে চলেছেন, তাই তাঁর কাজের সুফল পেতে আরও কিছু সময় অপেক্ষা করতে হবে। অসৎ ও অদক্ষ প্রশাসনের কারণে তলানিতে ঠেকা ভারতের ভাবমূর্তিকে তিনি স্বমহিমায় ও স্বাভিমানে বিশ্বের দরবারে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেছেন। আর এজন্যই হয়তো তিনি ভারতবাসীর মনে পাকা জায়গা করে নিয়েছেন। এত অল্প সময়ে এত সুবিশাল কর্মযজ্ঞ তো বটেই, এর পরিকল্পনা করাও একটি অতিমানবীয় কাজ। তাই পরিশেষে একথা বলাই যেতে পারে যে, প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শ্রীমোদী তাঁর প্রথম বছরের পরীক্ষায় শুধু পাশই করেননি, রেকর্ড নম্বর নিয়ে পাশ করেছেন। দেশের এক প্রথম শ্রেণীর ইংরাজি দৈনিক যে ৭৭.৫ শতাংশ নম্বর দিয়েছে তা অহেতুক নয়।

(লেখক চার্টার্ড ফিনান্স প্ল্যানার)

অম্লানকুসুম ঘোষ

মোদীর অর্থনীতি ও আমাদের অর্থনীতি

মহাকালের মহাপরিক্রমায় এক বছর এক অতি সামান্য মুহূর্তমাত্র। কিন্তু সাধারণ মানুষ-বিশেষের কাছে সেই এক বছরেরই গুরুত্ব অসামান্য। তাই জীবনের প্রতি ক্ষেত্রেই সেই এক বছর মূল্যায়নের সময় হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ছাত্রজীবন থেকে কর্মজীবন সর্বত্রই একই রীতি। তাই সাধারণ মানুষ রাষ্ট্র বা জাতির সামগ্রিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রেও এক বছরের অন্তরকেই গ্রাহ্য করে, চর্চা করে। সেই নিয়ম অনুযায়ীই বর্তমানে আমরা প্রবৃত্ত হয়েছি বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের এক বছর পূর্তি উপলক্ষে তার সাফল্য ও ব্যর্থতার মূল্যায়নে।

ব্যক্তি বা সমষ্টি যে কারুর মূল্যায়নই হয় বহুমাত্রিক। বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের মূল্যায়নও তাই বিবিধ দিক থেকে হওয়াই বাঞ্ছনীয়, এবং তা হচ্ছেও। বিদেশনীতি, শিল্পনীতি, অর্থনীতি, স্বরাষ্ট্রনীতি প্রভৃতি নানাবিধ বিষয়ে মূল্যায়ন চলছে ক্রমাগত। এর মধ্যে রাষ্ট্রের ফুসফুসতুল্য অর্থনীতির বার্ষিক মূল্যায়নই বর্তমান নিবন্ধের লক্ষ্য।

জাতীয় অর্থনীতির বিকাশের তিনটি পথ আছে। সেই তিনটি পথই বর্তমান সরকারের কর্ণধারের প্রাক্-নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি ও নির্বাচন পরবর্তী ঘোষণায় শ্রুত ও ঘোষিত হয়েছিল। সেই তিনটি পথ হলো : প্রথমত, অর্থনৈতিক বৃদ্ধি অর্থাৎ জিডিপি বৃদ্ধি ও সামাজিক আয় বৃদ্ধি। দ্বিতীয়ত, দুর্নীতি রোধ। তৃতীয়ত, অর্থনৈতিক ন্যায় প্রতিষ্ঠা ও অসাম্য দূরীকরণ। এই তিনটি পথের প্রত্যেকটি কতদূর অনুসৃত হয়েছে তা এক এক করে বিশ্লেষণে দেখা যাক।

প্রথম পথটি হলো বৃদ্ধির পথ। বৃদ্ধির লক্ষ্যে মোদী সরকার প্রথম থেকেই অবিচল। কট্টর মোদী বিরোধীরাও এই ব্যাপারে মোদীর বিরোধিতা বা নিন্দে বা সমালোচনা করতে পারেনি এখনও পর্যন্ত। বাজেটে পরিকাঠামো-খাতে বিপুল ব্যয়, বিনিয়োগ-বান্ধব পরিবেশ সৃষ্টির প্রয়াস, মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে আনা এবং আনুষঙ্গিক ব্যাপারে লালফিতার বাঁধন আলগা করা—এইসব পদক্ষেপই আয়বৃদ্ধির পথ প্রশস্ত করেছে। তার ফলাফলও দেখা গেছে নিখুঁতভাবে। এক বছরের মধ্যেই জিডিপি গ্রোথরেট পাঁচ শতাংশের জায়গায় আট শতাংশে দাঁড়িয়েছে। বাণিজ্যি-ঘাটতিও কমেছে প্রচুর। রপ্তানি বৃদ্ধি করে বৈদেশিক মুদ্রা আয় ও তার সঞ্চয় বৃদ্ধি করা এবং বৈদেশিক মুদ্রার তুলনামূলক মান হ্রাস পাওয়ায় দেশীয় অর্থনীতিকে বৈদেশিক বিনিয়োগের বান ডাকার লক্ষ্যে নরেন্দ্র মোদী সরকার বিদেশনীতির সাহায্য দিয়েছেন যা অর্থনৈতিক বিকাশের সহায়ক হয়েছে। বিভিন্ন দেশের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক চুক্তি সাধিত হয়েছে যা আমাদের দেশের রপ্তানি বৃদ্ধির পক্ষে সহায়ক হয়েছে। আবার ব্রাজিল, রাশিয়া, ভারত, চীন, দক্ষিণ আফ্রিকা এই পাঁচটি দেশ নিয়ে গঠিত ব্রিকস্ রাষ্ট্রগোষ্ঠীর মিলিত ভাবে গঠিত নিউ ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্কের প্রথম কর্ণধার হবার সুযোগ পেয়েছে ভারত। এর ফলে ভারতে পরিকাঠামো খাতে প্রচুর ঋণ পাবার সম্ভাবনা যা পরিকাঠামোগত উন্নতি ঘটিয়ে দেশকে সন্ধান দেবে অগ্রগতির নবপথের। অবশ্য পেট্রোলিয়ামের বিশ্ববাজারে দাম কমা ভারতের আমদানিজনিত ব্যয় কমিয়েছে এবং মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে রাখার ক্ষেত্রে সহায়ক হয়েছে। আবার জিডিপি-র মাপকাঠি'র পরিবর্তন হওয়ায় জিডিপি বৃদ্ধির হার কিছুটা বেশি হয়েছে। অনেকেই বলছেন এ দুটি সাময়িক ব্যাপার, কালক্রমে বিশ্ববাজারে পেট্রোলিয়ামের দাম বাড়বে আর জিডিপি'র সূচকেরও প্রত্যেক বছর পরিবর্তন ঘটবে না। তখন মোদী সরকারের সাফল্য এত মসৃণভাবে আসবে না। কিন্তু একথাও মনে রাখা দরকার মোদী সরকারের বর্তমান পদক্ষেপগুলি অধিকাংশই ভবিষ্যতের কথা মাথায় রেখে। তার সুফলগুলি এখনও পাওয়া যায়নি। যখন সেই সুফলগুলি ভারতীয় অর্থনীতি পেতে শুরু করবে তখন বিশ্ববাজারে পেট্রোলিয়ামের দামের পুনরায় উর্ধ্বগতি শুরু হলেও ক্ষতি কিন্তু হবে না।

দ্বিতীয় পথটি হলো দুর্নীতি দূরীকরণ। পূর্বতন সরকারের আমলে হওয়া লাগামছাড়া

শুধুমাত্র এক বছরে কোনো সরকারের অর্থনীতিকে সঠিকভাবে বিশ্লেষণ করা অসম্ভব। কারণ সুদূরপ্রসারী কার্যকলাপের দ্বারা অর্থনৈতিক পরিমণ্ডলে এক বছর বিচারের পক্ষে নেহাতই ক্ষুদ্র মাপকাঠি। তাই একথা বলাই যায় যে, প্রচলিত নিয়মানুযায়ী এক বছরের মূল্যায়ন করলেও এ ব্যাপারে প্রকৃত মূল্যায়ন করতে পারে একমাত্র সময়। তবে এক বছরে যে সদিচ্ছা ও সক্রিয়তা পরিলক্ষিত হয়েছে তা দেখে সোনালি ভবিষ্যতের আশায় বুক বাঁধতে পারে আপামর দেশবাসী।

দুর্নীতিই সেই সরকারের পতনের পথ প্রশস্ত করেছিল। বর্তমান সরকার সেই দুর্নীতি দূর করার প্রতিশ্রুতি দিয়েই ক্ষমতাসীন হয়েছিল এবং অনেকাংশেই সেই প্রতিশ্রুতি তারা রক্ষা করেছে। আগের জমানায় হওয়া টুজি দুর্নীতি ও কয়লা দুর্নীতি দূর করতে সচেষ্ট বর্তমান সরকার নিলামের বন্দোবস্ত করেছে এবং নিলাম থেকে এখন পর্যন্ত দু' লক্ষ কোটি টাকা সরকারি কোষাগারে আয় হয়েছে। এখনও অনেক নিলাম বাকি আছে অর্থাৎ আয় আরও বাড়বে এবং এর ফলে একদিকে যেমন দুর্নীতি দূর হবে অন্যদিকে সরকারি কোষাগারও পুষ্ট হবে। ফলে সরকারি আয় ব্যয় ঘাটতি হ্রাস পাবে, যা দেশের উন্নতির সহায়ক হবে। দুর্নীতি যাতে সমাজের তৃণমূল স্তরেও না ছড়াতে পারে তার জন্য সরকার ১০০ দিনের কাজ-সহ অন্যান্য নানান কাজে প্রদেয় অর্থ সরাসরি প্রাপকের অ্যাকাউন্টে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এর ফলে মধ্যস্বত্ব ভোগীর চুরি করার সম্ভাবনা কমবে যা অর্থনৈতিক দুর্নীতি দূর করার পাশাপাশি দরিদ্রতম মানুষের আয় বৃদ্ধির পক্ষে সহায়ক হবে। যার ফলে প্রান্তিক মানুষের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে। গ্রামীণ অর্থনীতিতে চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় উৎপাদন বাড়বে, ফলে কর্মসংস্থানের বৃদ্ধি ঘটেবে। ফলস্বরূপ ক্রয়ক্ষমতার আরও বৃদ্ধি আরও চাহিদা বৃদ্ধি আরও উৎপাদন বৃদ্ধি অর্থাৎ উন্নতির চক্রে আরোহণ করবে ভারতীয় গ্রামীণ অর্থনীতি। ভারতের ষাট শতাংশ মানুষের একমাত্র ভরসা ভারতীয় গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নতির চক্রে আরোহণ করা মানে দেশের সামগ্রিক উন্নতি, যা সমাগত প্রায়। দুর্নীতির আরও একটি প্রশস্ত পথ ছিল বেআইনি পঞ্জী স্কীমগুলি যেমন— সারদা, রোজভ্যালি ইত্যাদি। সেগুলির মূলোচ্ছেদ করতে ভারতী সরকার সিবিআই-কে সুপ্রিম কোর্টের অধীনস্ত করে তদন্তের স্বাধীনতা দিয়েছে। সিবিআইও তাদের কাজ শুরু

করেছে, অবশ্য শেষ করার আগে তাদের কাজের সাফল্য, ব্যর্থতা পরিমাণ করা সম্ভব নয়? সেগুলি তাই এই আলোচনার অন্তর্গত হওয়ার যোগ্য নয়। তবে সদিচ্ছা যে লক্ষিত হয়েছে তা অনস্বীকার্য। দুর্নীতির সবচেয়ে বড় অধ্যায় ছিল কালোটাকা সংক্রান্ত। বিদেশ থেকে কালোটাকা ফিরিয়ে আনার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন মোদী। সরকার প্রথম পূর্ণাঙ্গ বাজেটে বিদেশে কালোটাকার গমন ঠেকাতে বিল এনেছে। কিন্তু অতীতে বিদেশে পাড়ি দেওয়া কালোটাকার প্রত্যাবর্তনের জন্য এখনও কোনো ব্যবস্থা নেয়নি। অথচ সেই পাহাড়প্রমাণ কালোটাকার প্রত্যাবর্তন সম্ভব হলে ভারতীয় অর্থনীতির ভোল পাল্টাতে দ্বিতীয় কোনো উদ্যমের প্রয়োজন হোত না। দেশবাসী তাই কালোটাকা দেশে ফেরার প্রত্যাশা করছে। দেশবাসীর ইচ্ছাধীন মোদী সরকারকে সে কথা মনে রাখতে হবে।

অর্থনৈতিক ন্যায়প্রতিষ্ঠা ও দুর্নীতি দূরীকরণের ক্ষেত্রে মোদী সরকার অনেক দূর অগ্রসর হয়েছে। প্রত্যেক দেশবাসীর জন্য ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের ব্যবস্থা এবং প্রত্যেক অ্যাকাউন্ট হোল্ডারের জন্য জীবনবিমা ও দুর্ঘটনাবিমার ব্যবস্থা করা ইত্যাদি কাজ দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির সুফল সব মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার ব্যাপারে সহায়ক হবে। বা অর্থনৈতিক অসাম্য দূরীকরণের ব্যাপারে অত্যন্ত বড় একটি পদক্ষেপ বলেই ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে গৃহীত হবে। তবে অর্থনৈতিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার একটি বড় হাতিয়ার সরকার নিজেই হস্তচ্যুত করল। সেই অস্ত্রটি হলো সম্পদ কর। এই সম্পদ করের মাধ্যমে ধনীতম ব্যক্তিবর্গের (যাদের মধ্যে প্রাচীনকালের প্রজাশোষক মহারাজার দল এবং বর্তমানকালের ক্রেতা ও কর্মী শোষক ব্যবসায়ীর দল আছে) কাছ থেকে প্রচুর কর আদায় করে তা দিয়ে দরিদ্র ব্যক্তিবর্গের উন্নতি এবং সরকারি অবশ্য প্রয়োজনীয় নানা কাজে অর্থসংস্থান করা যেত। গত বছর পর্যন্ত এই সম্পদ করের হার ছিল এক শতাংশ। একশো কোটির বেশি সম্পদের মালিক এমন ব্যক্তিদের উপর এই কর পাঁচ শতাংশ হারে চালিয়ে সরকার সত্তর হাজার কোটি টাকা বেশি আয় করতে পারতো (বর্তমানে ভারতে একশো কোটি টাকার বেশি সম্পদ আছে এমন ব্যক্তিবর্গের মিলিত সম্পদের পরিমাণ কুড়ি লক্ষ কোটি টাকা)। তা না করে সম্পদ করটিই তুলে নেওয়া হয়েছে। এতে ক্ষতি বিবিধ। প্রথমত, সরকার আয় বৃদ্ধির সুযোগ হারাল ও আয় অনেক কমে গেল। দ্বিতীয়ত, অর্থনৈতিক ন্যায় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার বদলে এক্ষেত্রে অর্থনৈতিক অন্যায় বৃদ্ধি পেল। সম্পদ কর তুলে নেওয়ার কোনো সন্তোষজনক কারণ অর্থমন্ত্রী ব্যাখ্যা করেননি এবং আশ্চর্যের ব্যাপার বিরোধী দলগুলিও এ বিষয়ে নীরব।

এছাড়াও কিছু বকেয়া কাজ বর্তমান সরকারের করা উচিত, যা পূর্বতন সরকারের পাপ কিন্তু কষ্ট দিচ্ছে জনসাধারণকে, সেই পাপক্ষালন করা উত্তরাধিকার সূত্রে বর্তমান সরকারেরই কাজ। যেমন রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলির বকেয়া ঋণ আদায়ে তৎপরতা দেখানো (বকেয়া ঋণের বোঝায় রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলি মৃতপ্রায় এবং রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক-পরিকাঠামো ভেঙে পড়লে গোটা দেশের অর্থনীতিব্যবস্থাই বিপদগ্রস্ত হবে)। কিন্তু বিজয় মালিয়া-সহ কিছু ঋণখেলাপির বিরুদ্ধে সাজানো কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ ছাড়া কোনো বড় পদক্ষেপ এ ব্যাপারে করেনি কেন্দ্রীয় সরকার। অপরদিকে স্বেচ্ছাকৃত ঋণখেলাপিদের অসংযমী জীবনযাপন সমাজের সর্বস্তরের মানুষের ক্ষোভকে তীব্রতর করেছে।

পথচলার সময় শুধুমাত্র লক্ষ্যের দিকে লক্ষ করাই যথেষ্ট নয়, বরং পথের দু'পাশে মাঝেমধ্যে দৃষ্টিনিক্ষেপ করাও প্রয়োজনীয়। এক্ষেত্রেও তেমন অর্থনৈতিক বৃদ্ধির হার বাড়াতে গিয়ে আনুষঙ্গিক নানা বিষয় থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নেওয়া বোকামি। যেমন পরিবেশ। বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করতে গিয়ে নানা ক্ষেত্রে পরিবেশ সংক্রান্ত বিধিনিষেধ তুলে নেওয়া হচ্ছে যা দীর্ঘমেয়াদে দেশের জনজীবনের পক্ষে ক্ষতিকর। দ্বিতীয়ত, জমি বিল। বিনিয়োগকারীদের জন্য জমি অধিগ্রহণ সাধু প্রস্তাব, কিন্তু তা করতে গিয়ে কৃষকের একেবারেই বিস্মৃত হওয়াও উচিত নয়। ইউপিএ সরকার কৃষকের নাম করে বিনিয়োগকারীদের একেবারে নিরুৎসাহিত করেছিল, বর্তমান সরকার বিনিয়োগ আকর্ষণ করতে গিয়ে কৃষকদের বিপদগ্রস্ত করলেন। দরকার উভয়পক্ষের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষাকারী এক নিরপেক্ষ ব্যবস্থা। এখনও সে ব্যবস্থা দেশে অধরা।

আলো ও অন্ধকারের সমন্বয়েই গঠিত হয় মহাবিশ্ব। দোষ ও গুণের সমন্বয়েই গঠিত হয় মানবচরিত্র। সেরকমই বহু সমোয়াচিত সদর্থক পদক্ষেপ ও কিছু ত্রুটি বিচ্যুতি নিয়ে গঠিত মোদী সরকারের প্রথম এক বছরের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড। তবে শুধুমাত্র এক বছরে অর্থনীতিকে সঠিকভাবে বিশ্লেষণ করা অসম্ভব। কারণ সুদূরপ্রসারী কার্যকলাপের দ্বারা অর্থনৈতিক পরিমণ্ডলে এক বছর বিচারের পক্ষে নেহাতই ক্ষুদ্র মাপকাঠি। পরিশেষে, তাই একথা বলাই যায় যে, প্রচলিত নিয়মানুযায়ী এক বছরের মূল্যায়ন করলেও এ ব্যাপারে প্রকৃত মূল্যায়ন করতে পারে একমাত্র সময়। তবে এক বছরে যে সদিচ্ছা ও সক্রিয়তা পরিলক্ষিত হয়েছে তা দেখে সোনালি ভবিষ্যতের আশায় বুক বাঁধতে পারে আপামর দেশবাসী। ■

মোদী এখন বিশ্ব দরবারে ভারতের শক্তির সওদাগর

সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়

এই মে মাসের শেষাশেষির দিক থেকেই শুরু হয় সারা দেশ ব্যাপী নানান বোর্ডের আওতায় থাকা ছাত্রছাত্রীদের জীবনের প্রথম বড় পরীক্ষার ফলপ্রকাশ। এর সঙ্গে এ বছর যোগ হয়ে গেল মোদীজীর নেতৃত্বে থাকা এনডিএ জমানার প্রথম বছরের সালতামামি। আজকাল বোর্ডগুলিতে নম্বর দেওয়ার প্রবণতা গগনচুম্বী আর গত ১০ বছর ধরে ক্রমিক অধোগমনরত সরকারের অধীনে থাকা আমাদের দেশের মানুষেরও এই সরকারের কাছে চাওয়া পাওয়ার মানদণ্ডটি হঠাৎ বিশাল হয়ে উঠেছে।

গত এক বছরে কি হলো, কি পাওয়া গেল— এই নিয়ে বেশ সোরগোল। বিশেষ করে সংবাদপত্র ও বৈদ্যুতিন মাধ্যমগুলি তোলপাড় হয়ে চলেছে একে অপরের সঙ্গে প্রতিযোগিতায়। এখানে একটা কথা, যে ছেলে বা মেয়ের পরীক্ষায় মোটামুটি ভাল নম্বর পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে তার ওপরই থাকে প্রত্যাশার চাপ। অঙ্কে ৫ পাওয়া ছেলের কেউ খোঁজ নেয় না। প্রধানমন্ত্রী মোদী দেশের মানুষের কাছে অজান্তেই স্টার পাওয়া ছাত্র হয়ে উঠেছেন। লক্ষণীয়, সম্প্রতি একটি বহুল প্রচলিত ইংরেজি দৈনিক এবার প্রায় আত্মসমর্পণ করে মোদী সরকারের কাজকর্মের ওপর ৭৭ শতাংশ নম্বর দিতে বাধ্য হয়েছে। খেয়াল রাখতে হবে, মোদীজী বরাবরই ইংরেজি মিডিয়া হাউসকে এড়িয়ে চলেন। এর মূল কারণ অনেক গভীরে। এটি অনেকাংশেই ঔপনিবেশিক খোঁয়াড়ি (Post Colonial Hang over)। সেই জনপ্রিয় গানটি স্মরণে আসে— 'সাহেবরা সব চলে গেছে স্বাধীন করে দেশটাকে, আমরা তাদের ছাড়িনিকো ধরে আছি ন্যাজটাকে'। এই ইংরেজি মিডিয়া তার যত্ন লালিত উন্নাসিকতায় বিজেপি-র উদ্দেশ্যে—'কাউ বেল্ট-এর দলের' মতো অবমাননাকর তকমা দীর্ঘদিন সেঁটে রেখেছে। কচ্ছ থেকে কন্যাকুমারী, লাদাখ থেকে দার্জিলিং দলের সাংসদ থাকলেও তাঁরা কুরুচিকর তকমা দিয়ে দলকে শুধু নয় সমগ্র দেশবাসীকেও খাটো করে এক বিজাতীয় আনন্দ উপভোগ করে। আর একটি বিষয়— এই প্রথম বছরে ভূলুণ্ঠিত কংগ্রেস ও তার সঙ্গে সহাবস্থানে অভ্যস্ত মূল ধারার মিডিয়ার গলাধঃকরণে যেটা বিশেষ অস্বস্তিকর মনে হচ্ছে, তা হলো কংগ্রেস ছাড়া অন্য কোনো রাজনৈতিক শক্তি এককভাবে ক্ষমতার শীর্ষে কেন? কংগ্রেস মানে ইংরেজের প্রতিষ্ঠিত দল, কংগ্রেস অর্থে তথাকথিত স্বাধীনতা-আনা দল, কংগ্রেস মানে নেহরু গান্ধী পরিবারের দল। কংগ্রেস মানেই জাত শাসক। এই যে ভাবনা শৃঙ্খল, এর বাইরে বেরোলেই এঁদের মনে হয় দেশ বুঝি রসাতলে গেল। লাগাও মিডিয়াকে কেন সে ছিদ্রান্বেষণ করতে পারছে না। এরই দোসর হিসেবে যে বামমার্গী সংস্কৃতিটি দেশের পরগাছা হয়ে বাড়বৃদ্ধি ঘটিয়েছিল সেটিরও সাংসদ সংখ্যার নিরিখে প্রায় 'ইন্তেকাল' ঘটে গেছে। মূলত মুসলমান তোষণ-নির্ভর দল হওয়ায় পশ্চিমবঙ্গের নতুন 'জামাত-এ ধূল কা ফুল' বামপন্থীদের ক্ষমতা কেড়ে নিয়েছে। আজ বড় দুর্দিন। মিডিয়াতেও বরাত মিলছে না। যাই হোক, এরা এখন নির্বিষ। পুরোনো ঘি, মকরধ্বজের মতো নিজেদের অন্তিম দশার কারণ অন্বেষণে মশগুল। এই বাজারে পরীক্ষা চলছে মোদীর। তিনি কী করেছেন? তাঁর ওপর বেজায় চটে কেউ বলছে ক্ষমতা তাঁর একার হাতে চলে যাচ্ছে। অবশ্যই, ভারতের মতো বিশাল এক গণতান্ত্রিক দেশে ভূতে সরকার চালাবে? দেশবাসী আর তা মেনে নেবে না। প্রধানমন্ত্রীর অফিস ও দেশের জন্য নেওয়া সিদ্ধান্তগুলি ৭নং রেসকোর্স থেকেই বেরোবে। সেইসব সিদ্ধান্ত সুড়ঙ্গ পথে ১০নং জনপথের বিপুল ক্ষমতাধর অথচ দায়বদ্ধতাহীন কারুর সম্মতি জুটিয়ে তবে কার্যকর হবে— এমনটা আর ঘটবে না। প্রথম কাজ মোদী করেছেন দেশের প্রধানমন্ত্রীর অফিসের মর্যাদা পুনরুদ্ধার করে।

মনে রাখবেন এমনটা আন্দাজ করেই ধুরন্ধর কংগ্রেস সভানেত্রী পরাজয়ের পরের দিনই প্রবল ক্ষমতাশালী আমেরিকার ধাঁচে গড়া ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিল

(এনএসসি) ভেঙে দেন। প্রধানমন্ত্রীর অফিসকে এড়িয়ে এই সোনিয়া গান্ধী নিয়ন্ত্রিত সংস্থাই দেশের সমস্ত রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক শক্তি, পরিকাঠামো সংক্রান্ত ক্ষেত্রের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে হস্তক্ষেপ করত। এটির স্বাভাবিক পতন মোদীর প্রত্যক্ষ কীর্তি। দ্বিতীয়ত মিডিয়ার উষ্মা। প্রধানমন্ত্রীর বিদেশ ভ্রমণের সময় চিরাচরিতভাবে এক বিপুল মিডিয়াবাহিনী অনেক সময়ই প্রয়োজনীয় রাজনৈতিক দূরদর্শীতাহীন হওয়া সত্ত্বেও দেশের খরচে বিদেশ সফরে যেত। প্রধানমন্ত্রী এই প্রক্রিয়ায় বিপুল ছাঁটকাঁট করে দেন। এদের বাজারে ওজন কমে যায়। আজকাল মাতৃভাষার- সংবাদপত্রগুলিতেও ভুঁইফোড় সাংবাদিকরা ১ লাইন নিউজ লিখে অবলীলায় তাদের ৫ লাইন ভিউজ মিশেল দিয়ে দিচ্ছে। এঁরা সবাই এক একজন Political appraiser অর্থে রাজনৈতিক নিরীক্ষকের ভূমিকা পালন করছেন। এঁদের প্রজ্ঞা, সহজাত প্রতিভা অনেক সময়ই Socrates, Plato, Copernicus বা চাণক্যকেও হার মানতে পারে। মোদীজী এঁদের বেশি পাত্তা দেননি। এঁরা আজ ভাবতে বাধ্য হচ্ছেন মোদীর নেতৃত্বে বিজেপি এখন দেশের কেন্দ্রীয় শক্তি। বাকি সব দলই বিজেপির সঙ্গে লড়বে। যা ১০ বছর আগেও কংগ্রেসের ছিল। গত ২০ বছরের চেষ্টায় মোদীর নেতৃত্ব আজ দলকে আন্তর্জাতিক মর্যাদা দিয়েছে। এক বছরে দল সদস্যপদের হিসেবে বিশ্বে সর্ববৃহৎ। ৫৭ দিন তিনি বিশ্ব দরবারে ভারতের শক্তির সওদাগর হিসেবে ভ্রমণ করেছেন। কি এনেছেন?' সব কাগজ, সব খবরেই তা বেরিয়েছে। এর নমুনা দেখে নেওয়া যেতে পারে। (১) তাঁকে যারা ভিসা দেয়নি তারা নিজস্বার্থে তাঁর শপথ গ্রহণের আগেই তাঁকে আমেরিকা সফরের আমন্ত্রণ জানায়। বহুলাংশে তাদের মদত-প্রাপ্ত স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলি (এনজিও) যতই তাঁকে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় অভিযুক্ত করুক (তিস্তা শিতলবাদ) মানুষের বিপুল জনাদেশ সেগুলিকে অসার প্রতিপন্ন করে। সব ঘটনাই যে নির্দিষ্ট দেশের জনসংখ্যা ও পরিস্থিতি নির্ভর এই উপলব্ধি গত এক বছরে শক্তিধর আমেরিকার হয়েছে। মোদী চোখে চোখ রেখে 'বারাক' সম্বোধন করছেন। এক বছরে বিশ্ববাসীর সঙ্গে মেলামেশায় হীনমন্যতাবোধ তিনি দেশবাসীর প্রতিনিধি হিসেবে অনেকটাই কাটিয়ে দিয়েছেন। পরিবেশ সংরক্ষণ, বনবাসী কল্যাণ প্রভৃতি নানান অছিলায় উন্নয়ন বাধা দেওয়ার কলকাঠি নাড়তে ওস্তাদ বিদেশি কায়েমি স্বার্থের অর্থপুষ্ট ২৯০০০ হাজার এনজিও-এর লাইসেন্স এক ধাক্কায় বাতিল হয়েছে। এঁদেরই কয়েকজন সোনিয়া গান্ধীর কমিটিতে (অরুণা রায়) ছিলেন। এঁরা এমন বন, খনিজ সম্পদ রক্ষা করেছিলেন যেগুলি বাতিল করার পর শুধু কয়লা খনি নিলাম করে সরকার ২ লক্ষ কোটি টাকা অর্জন করছে। টাকাটা কম নয়! কয়েকটি বাণিজ্যিক পরিসংখ্যান দিলেই তাঁর প্রথম বছরের বিদেশ সফরের কার্যকারিতা বোঝা যাবে।

(১) আমেরিকান বিনিয়োগকারীরা আগামী তিন বছরে ভারতে ৪১ বিলিয়ন ডলার লগ্নি করবে। (২) ওবামা স্বয়ং ৪ বিলিয়ন ডলার ভারতে বিনিয়োগ ও ধারের চুক্তিপত্রে সই করেছেন। (৩) জাপানের প্রধানমন্ত্রী ৫ বছর ধরে ৩৫ বিলিয়ন ডলারের সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে বিনিয়োগের চুক্তি করেছেন। (৪) যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত নিয়ে ফ্রান্স থেকে ৩৬টি Rafale fighter বিমান কেনা হচ্ছে। উল্লেখ্য, দুর্নীতি অবশ্যম্ভাবী জেনে সেনাবাহিনীকে চরম দুর্বল রেখেও তদানীন্তন প্রতিরক্ষামন্ত্রী অ্যান্টনি প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে কোনো যুদ্ধাস্ত্র ক্রয় প্রায় বন্ধ করে ফেলেছিলেন। (৪) পারমাণবিক ক্ষেত্রের জটিলতা আমেরিকার সঙ্গে কাটিয়ে উঠেছে মোদী সরকার। (৫) মেক ইন ইন্ডিয়া প্রকল্পে জাপান সক্রিয়ভাবে যোগ দিয়েছে। স্বল্প খরচের 'উৎপাদন ক্ষেত্র' তৈরি করতে তাদের জুড়ি নেই। মারুতি, সুজুকি, নিকন-এর ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ প্রমাণ রয়েছে। (৬) হ্যাঁ, চিরশত্রু চীনে কি অশ্বডিম্ব প্রসব হলো? না। মোদী-ঝি ভাই ভাই হয়ে দিল্লী-বেজিং ২২ বিলিয়ন ডলারের ২৬টি চুক্তি হয়েছে। এই চুক্তিগুলি মূলত শক্তি, পরিকাঠামো, পুনর্নবীকরণ শক্তি, ইস্পাত এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প সংক্রান্ত। চীনের সঙ্গে অসম বাণিজ্যের বিষয়ও উঠে এসেছে। ভারত থেকে সে দেশে রপ্তানি বাড়াবার ব্যবস্থা হচ্ছে। সীমান্ত লঙ্ঘন অনেক কমেছে। গুজরাটের স্থানীয় নেতা হিসেবে তাঁকে বিদেশ নীতির ক্ষেত্রে অজ্ঞ বলে প্রতিপন্ন করার চেষ্টায় ত্রুটি করেনি কংগ্রেসের জনবিচ্ছিন্ন রাজ্যসভার নেতারা। এদের মধ্যে একজন আবার রাজ্যসভায় যেতে কাশ্মীরি বিচ্ছিন্নতাবাদীদের মদতে জেতা সাংসদকে আফজলগুরুর ফাঁসি দেওয়া অন্যায় হয়েছিল বলে মুচলেখা দিয়ে ভোট কিনেছিলেন বলে খবর। কেউ কোনো অলীক স্বপ্নেও ভেবেছিল কাশ্মীরে বিজেপি সরকারের অংশীদার হবে। ঘুষ নিজে খাব না খেতেও দেব না স্লোগান অক্ষরে অক্ষরে সফল করে দিল্লীর ক্ষমতা অক্ষ থেকে কুখ্যাত দালালচক্র আজ নির্বাসিত। মোদীজী এখন অনেক স্বপ্নের ও অগোচর স্বপ্নকে সফল করেছেন। দেশ তাকে বিশ্বাস করে। রাজ্যসভার ক্ষমতাভোগে অভ্যস্ত জনসমর্থনহীন নেতারা বা মিডিয়া যতই অস্থির হোক না কেন দেশবাসী এই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ নেতাকে সময় দিতে চায়। ■

যুদ্ধবিধ্বস্ত ইয়েমেন থেকে নিরাপদে উদ্ধার ভারতীয়দের।

তৃতীয় পক্ষের চোখে মোদী সরকার

নীতীন রায়

আই এম এফ প্রধান ভারতে আসছেন। তিনি ভারত ও চীন ভ্রমণ করবেন। ভারতের অর্থনৈতিক সংস্কার, উদারনীতি ও অর্থনৈতিক বৃদ্ধির হার তাঁকে ভারতমুখী করেছে। তিনি জানবেন, বিশ্ব অর্থনীতিতে ভারত কী ভূমিকা রাখবে। গত এক বছরে মোদী সরকারের কাজকর্ম বিশ্বকে ভারত সম্পর্কে ভাবাতে বাধ্য করেছে। বিভিন্ন গবেষণা সংস্থার রিপোর্ট, বিশ্বশক্তির সঙ্গে ভারসাম্যের কূটনীতি, টাইম ও ফরচুন পত্রিকার মতামত ভারতকে বিশ্বের অন্যতম শক্তি হিসেবে চিহ্নিত করেছে।

তাই দেখা যাক, তৃতীয় পক্ষ অর্থাৎ বিশ্বের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠিত সংস্থাগুলি বা পত্র-পত্রিকা কী বলছে। এদের বক্তব্যে নিরপেক্ষ বিচার সম্ভব। মোদী সরকারের প্রশংসা তারা করছে সম্পূর্ণ ভারতহিতে নয়, বিশ্বহিতের জন্যও ভারতের ভূমিকা প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে বলে তারা মনে করে। ব্যক্তি মোদীর প্রশংসাও মোদী সরকারের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। এখন দেখা যাক কে কি বলছে।

OCCD : প্যারিসের একটি নামি অর্থনৈতিক গবেষণা সংস্থা যার পুরো নাম 'দ্যা অর্গানাইজেশন ফর ইকোনমিক কো অপারেশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট' (ও সি সি ডি)। তারা ভারতের অর্থনীতিকে দৃঢ় এবং উন্নয়নমুখী বলেছে। অন্য দিকে রাশিয়ার অর্থনীতিকে 'লস গ্রোথ' বলেছে। এই সংস্থার গবেষণার মানদণ্ড হচ্ছে 'কমপোজিট লিভিং ইনডিকেটর' বা সিল। এরা কোনো বিষয়ের ট্রেন্ড বা প্রবণতা হিসেব করে। ২০১৫-১৬ ভারতের অর্থনীতিতে প্রগতির হার ৭.৪ শতাংশ হবে বলে তারা জানিয়েছে। এদের মতে ২০১৪-র সেপ্টেম্বরে এই প্রবণতা ছিল ৯৯ শতাংশ। জানুয়ারি মাসে প্রবণতা হলো ৯৯.৩ এবং মার্চ মাসের প্রবণতা ৯৯.৫। প্রবণতার লক্ষণ গতিশীল অর্থনীতির পরিচায়ক।

মুডি বা মুডি সার্ভিসেস লিমিটেড :

আই এম এফ-এর ভবিষ্যদ্বাণীর রেশ কাটতে না কাটতেই মুডির রেটিং মোদী সরকারকে স্বস্তি দিয়েছে। আই এম এফ-এর মতে ভারত ২০১৫-'১৬ সালে তার প্রগতিকে ৭৫ শতাংশে নিয়ে যাবে। মুডি ও তার নতুন রেটিং একই কথা বলেছে। মুডির এই মূল্যায়ন আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতের সম্মান বৃদ্ধি করেছে। শুধু তাই নয়, ভারতের অর্থনীতিকে গতিশীলও বলেছে মুডি। তবে মুডির মতে ভারতের সরকারি কোম্পানিগুলো নানা দোষে দুষ্ট। যেমন,

(১) ভারতের সরকারি কোম্পানিগুলো অদক্ষতার জন্য কুখ্যাত।

(২) আমলাতন্ত্রের জন্য বেগ পোহাতে হয়।

(৩) দুর্নীতির জন্যও বহু আলোচিত।

এদের সম্পত্তি বিক্রির মাধ্যমে ভারতীয় অর্থনীতিকে চাঙ্গা করা যেতে পারে। মুডির মত, শিল্প পরিষেবা গড়ে তুলতে এই অর্থ ব্যয়

করা যেতে পারে।

মুডি তার রেটিং চেঞ্জ করছে। এজন্য ভারতীয় ব্যাঙ্কগুলি অভিনন্দন জানিয়েছে। মুডি রেটিং চেঞ্জ করতে গিয়ে যা বলেছে তা হচ্ছে— (১) ভারত মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হয়েছে, (২) মোদী সরকারের নীতির ফলে অর্থনীতিতে বিনিয়োগ বাড়ছে, (৩) অর্থনৈতিক প্রগতির হার ৭.৫ শতাংশ, (৪) স্বাধীনভাবে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক রাশ নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে। (৫) ডিসইনভেস্টের মাধ্যমে সংগৃহীত অর্থ পরিষেবাতে লাগাচ্ছে মোদী সরকার। (৫) ভারতের প্রশাসনিক লাল ফিতে ও কর ভারের জন্য বিনিয়োগ কম হচ্ছিল। বর্তমানে তার পরিবর্তন ঘটেছে।

বিশ্ব ব্যাঙ্ক, আই এম এফ ও ইকোনমিক সার্ভে

—এই তিনটি সংস্থাই প্রায় মুডির কথাই বলছে।

প্রথমে দেখা যাক ভারতে অর্থনৈতিক প্রগতির ভবিষ্যদ্বাণী প্রসঙ্গে তারা কে কি হিসেব করেছে :

	২০১৪	২০১৫	২০১৬
(১) আই, এম, এফ	৭.২%	৭.৩%	৭.৫%
(২) বিশ্ব ব্যাঙ্ক	৭.২%	৭.৫%	৭.৭%
২০১৪-১৫		২০১৫-১৬	
(৩) আর বি আই	৭.৫%	৭.৮%	
(৪) ইকোনমিক সার্ভে	৭.৪%	৮.১% - ৮.৫%	

ভারত এশিয়ার তৃতীয় অর্থনৈতিক শক্তি। চীনের অর্থনৈতিক প্রগতির হার ক্রমশ নীচে নেমে যাচ্ছে। ২০১৪ সালে চীনের অর্থনৈতিক প্রগতি হচ্ছে ৭.৪%। ২০১৬-১৭ সালে তা নীচে নেমে গিয়ে হবে ৬.৮%।

বিশ্ব ব্যাঙ্ক দক্ষিণ এশিয়ার অর্থনৈতিক রিপোর্টে এবং আই এম এফ তার ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক আউট লুকে একই কথা বলেছে। এইসব সার্ভেতে একটা কথাই উঠে এসেছে যে মোদী সরকার ভারতকে সঠিক পথেই নিয়ে যাচ্ছে।

ফরচুন ম্যাগাজিনে নরেন্দ্র মোদী ও তার সরকার

ফরচুন পত্রিকা পৃথিবীর অসাধারণ লোকদের নিয়ে তালিকা তৈরি করে। ওই পত্রিকায় নরেন্দ্র মোদী ও নোবেল লরিয়েট কৈলাস সত্যার্থীর নাম রয়েছে। নরেন্দ্র মোদীর নাম পঞ্চমে ও সত্যার্থীর নাম অষ্টাদশে রয়েছে। অ্যাপেলের সিইও টম কুক প্রথম স্থানে। লক্ষণীয় বিষয় হলো, বরাক ওবামার নাম সেখানে গত দু' বছর ধরে নেই।

মোদীর নেতৃত্বে ভারত উদার অর্থনীতি গ্রহণ করেছে। নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি তিনি পুরো করার চেষ্টা করছেন। ভারত ব্যবসায়ীসুলভ মনোবৃত্তি নিয়ে এগোচ্ছে। তিনি শৌচাগার, সেনিটেশন ও স্বচ্ছতার উপর জোর দিচ্ছেন। এশিয়ার দেশগুলোর ও আমেরিকার সঙ্গে ভালো সম্পর্ক গড়ে তুলেছেন। পত্রিকাটি আরও বলেছে যে তিনি ভারতকে দুর্নীতিমুক্ত করতে চেয়েছেন। লাল ফিতের দৌরাত্ম্য কমেছে। আমলাদের সংখ্যা কমিয়েছেন। ভারতে আসার ভিসাও সহজ সরল হয়েছে।

রাফেল ডিল ও কূটনীতি

ভারতের বিমানবাহিনী ক্রমশ দুর্বল হয়ে যাচ্ছিল। কংগ্রেস সরকারের অপদার্থতা শত্রুর মুখে হাসি ফোটাচ্ছিল। গত ১৭ বৎসর ধরে বিমান কেনা হয়নি। ২০১১ সালে রাফেল বিমান কেনার কথা হওয়া সত্ত্বেও চুক্তি এগোচ্ছিল না। মোদী ভারসাম্যের কূটনীতিতে হেঁটে চলেছেন। তিনি বিশ্বরাজনীতিকে ইউরো-আটলান্টিক থেকে এশিয়া-পেসিফিকে নিয়ে আসছেন। বিদেশে ভারতের আকর্ষণ প্রধানত (১) জিডিপির ৪০ শতাংশ বৈদেশিক বাণিজ্য যা ৭০ শতাংশতে উন্নীত হবে।

(২) ভারত পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি অস্ত্র আমদানি করে থাকে।

(৩) ভারতের বিশ্বাসযোগ্যতা রয়েছে।

মোদী একে কাজে লাগিয়েছেন, বিশ্বশক্তিধর দেশগুলো ভারতকে অস্ত্র, বিমান, রিঅ্যাক্টর (পরমাণু) ও ইলেকট্রিকেল ভারী মেশিনারি দিতে রাজি হয়েছে। কানাডা ৫ মেট্রিকটন ইউরেনিয়াম দিতে রাজি হয়েছে। ভারতে অর্থনৈতিক প্রগতির হার ৭.৫ শতাংশ হবে বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন। রাফেল চুক্তি একটি সফল কূটনীতিক বিজয়।

টাইম ম্যাগাজিনে বরাক ওবামা

বরাক ওবামা নরেন্দ্র মোদীর প্রশংসা করেছেন। তাও আবার টাইম ম্যাগাজিনে। তিনি বলেন, নরেন্দ্র মোদী এক গরিব পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি তাঁর বাবাকে সাহায্য করতে চা-ও বিক্রি করেন। তিনি যোগী। আবার আর্থিক ব্যবস্থার বাস্তব দর্শনে বিশ্বাসী। দরিদ্র পরিবারে জন্ম ও ১২০ কোটির দেশের গণতান্ত্রিক ভাগ্যবিধাতা। তিনি সত্যিকারের বড় নেতা এবং প্রাচীন ভারত ও আধুনিকতার মিশেল। তিনি যোগে বিশ্বাসী আবার টুইটারে লোক জোটাতেও পারেন।

ভারত-চীন বর্ডার ম্যানেজমেন্ট

চীনের সঙ্গে ভারতের সীমা ৪০৫৭ কিলোমিটার। এই সীমা নিয়ে ভারতে অস্বস্তি ও অপমানের শেষ ছিল না। চীন সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতের উপর কূটনৈতিক চাপ সৃষ্টি করতো। কংগ্রেস সরকার তার কোনো সমাধান সূত্র বের করতে পারেনি।

(১) ইন্দো টিবেটিয়ান বর্ডার পুলিশের সংখ্যা ১০ হাজার থেকে ২০ হাজার করা হয়েছে।

(২) অরুণাচল প্রদেশে ৫৪টি পোস্ট বাড়ানো হয়েছে। আরও ৮টি ব্যাটিলিয়ান অরুণাচলে বাড়ানো হয়েছে।

(৩) দু'টি MI-17V5 চপার বাড়ানো হয়েছে।

(৪) অরুণাচলে ৭টি বিমানঘাঁটি তৈরি হবে।

(৫) ১৮ বার চীনের সঙ্গে গোলটেবিল বৈঠক হয়েছে।

(৬) অরুণাচলকে রেললাইনে যুক্ত করা হবে।

২০১৫ সালের মার্চ মাসে (২০ তারিখ) ভারতীয় বাহিনী চীনা বাহিনীকে টক্কর দেয়। দুই বাহিনী মুখোমুখি হয়। পিছু হটে। কূটনীতি ও সামরিক শক্তি— এই দুইকেই কাজে লাগাচ্ছে মোদী সরকার।

ইয়েমেনে 'অপারেশন রাহাত'

ইয়েমেনের পরিণতি ইসলামিক রাষ্ট্রের এক পরিণতি। শিয়া ও

সুন্নির লড়াই। শিয়া বিদ্রোহীরা লড়াই চালাচ্ছে। স্বাভাবিক কারণেই সৌদি আরব সুন্নিদের হয়ে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছে। সৌদি আরবের বোমাবাজিকে ইরানের শাসনকর্তা খামেনি ‘জেনোসাইড’ বলে আখ্যা দিয়েছেন। তা এখন লড়াই মারণ যুদ্ধে রূপ নিয়েছে। ভারতের হাজার পাঁচেক নাগরিক তাতে আটকে পড়েছিল। সৌদি আরবের সঙ্গে কথা বলে আমাদের প্রধানমন্ত্রী ও সুষমা স্বরাজ সোস্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে স্থানীয় নেতৃত্বের সঙ্গে যোগাযোগ গড়ে তুললেন। তার ফলে ভারতীয়রাও সোস্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে সানায় একত্রিত হলো।

জিবোতিতে (Digibouti) আগেই পৌঁছে গিয়েছিল ভারতের তিনটি যুদ্ধ জাহাজ। জাহাজগুলো হলো— (১) আই এন এস সুমিত্রা (২) আই এন এস মুম্বই এবং (৩) আই এন এস টারকম। আই এ এস-এর দু’টি Globe Master-C17 বিমান সানা, আগ মৌলানা ও আলহোদিদা থেকে জিবেতিতে আটকে পড়া মানুষদের নিয়ে আসে। তারপর এডেনে। দু’টি যাত্রীবাহী জাহাজকেও নিয়ে গিয়েছিল ভারত। ২৬ টি দেশ-সহ জার্মানি, ফ্রান্স, ইউ কে, বাংলাদেশ ও শ্রীলঙ্কা তাদের নাগরিকদের উদ্ধার করার জন্য অনুরোধ জানায়। ইয়েমেনে ৫০০০ ভারতীয়দের মধ্যে ১০০০ জন যারা ইয়েমেনিদের বিয়ে করেছে।

২০০০ ভারতীয় নাগরিক অবৈধভাবে সেখানে আছে। পুরো অপারেশন রাতের অন্ধকারে গোলাগুলির মধ্যে হয়েছে। ভারতের বিদেশ প্রতিমন্ত্রী ভি কে সিং নিজে সেনার সঙ্গে জুড়ে ছিলেন। সুষমা স্বরাজ সোস্যাল মিডিয়ার সর্বোচ্চ ব্যবহার করে সবাইকে চমকে দিয়েছেন।

বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূতের মুখে ভারতের প্রশংসা

সংস্কার ও প্রগতির কথা ভেবে বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূতরা মুখ খুলেছেন।

(১) আমেরিকার রাষ্ট্রদূত রিচার্ড ভার্মা বলেছেন, ভারত আমেরিকার স্ট্র্যাটেজিক পার্টনারশিপ বিশ্ব অর্থনীতি ও গণতন্ত্রকে সমুন্নত রাখবে। (২) চীনা রাষ্ট্রদূতের মতে মোদীর ‘মেক ইন ইন্ডিয়া’, স্মার্ট সিটি ও অন্যান্য প্রজেক্টগুলোতে চীনের পজিটিভ সমর্থন রয়েছে। (৩) জাপানি রাষ্ট্রদূত বলেছেন, আমরা সমীক্ষা করে দেখেছি আগামী তিন বৎসর ভারতই বিনিয়োগের লক্ষ্যস্থল হবে। (৪) বৃটিশ রাষ্ট্রদূত বলেন, ভারতের উত্থান প্রত্যেকের স্বার্থেই প্রয়োজন। (৫) কানাডার রাষ্ট্রদূত ভারতকে সমস্যা জর্জরিত পৃথিবীর সমস্যা সমাধানে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেবার কথা বলেছেন।

সব শুনে মনে হচ্ছে, ভারত পৃথিবীর প্রয়োজনে জাগরিত হচ্ছে। মোদী সরকার এই বার্তাই পৃথিবীকে দিয়েছেন। পরম বৈভবশালী ভারতের জন্ম হতে চলেছে। ‘রাফেল ডিল’ ও ‘অপারেশন রাহাত’ মোদী সরকারের দক্ষতারই প্রমাণ। ■

EMINENCE ACADEMY

A VOCATIONAL TRAINING CENTRE FOR

FIRE & SAFETY TRAINING | SKILL DEVELOPMENT

SPOKEN ENGLISH | PERSONALITY DEVELOPMENT

INTERNATIONAL ACCREDITATION ORGANIZATION
IAO

A unit of Ayush Builders Pvt Ltd,
25 Ganesh Chandra Avenue
Ground Floor, Kolkata - 700013.
(O):033- 22363332(M): 9432574850

GREEN TRIANGLE
FOR SAFETY

অতিথি কলম

মুজফ্ফর হোসেন

আরবদেশগুলিতে ভারতীয় মুসলমানদের বিব্রত জীবন

পাঠকরা যদি না ভুলে গিয়ে থাকেন তাহলে হয়তো মনে আছে, মোরারজী দেশাই মন্ত্রিসভায় বিদেশমন্ত্রী থাকাকালীন অটলবিহারী বাজপেয়ীর কারণেই সাধারণ মানুষ যাতে সহজেই পাসপোর্ট পায় সেই ব্যবস্থা অনেক সহজ হয়েছিল। তখনও পর্যন্ত একজন সাধারণ নাগরিককেও রাজ্যের রাজধানীতে গিয়ে পাসপোর্ট করাতে হোত এটাই ছিল নিয়ম। যখন জেলা থেকেই এই কাজ হতে লাগল তখন মানুষের বিদেশ যাত্রা অনেক সহজ হয়ে গেল। যদি ভালো করে দেখা হয় তবে দেখা যাবে এর লাভ সব থেকে বেশি হয়েছিল ভারতীয় মুসলমানদের। এতে তো হজযাত্রীর সংখ্যা ব্যাপকভাবে বেড়ে গেল আর অশিক্ষিত মুসলমানদের কাছে আরবের দরজা খুলে গেল। এর ফলে একজন সাধারণ মুসলমানও আরবে গিয়ে কাজ করার সুবিধা পেল। এখন আরবে যারা যায় তাদের মধ্যে শিক্ষিত মুসলমানদের উঁচুপদে কাজ করার সুযোগ এসে গেছে। শিক্ষিত মুসলমানদের আরবে যাওয়ার সংখ্যা বাড়লেও এখনও যারা ওখানে চতুর্থশ্রেণীর নাগরিক তারাও যে-কোনো ছোটবড় কাজ করে নিজেদের জীবন চালিয়ে নিচ্ছে। প্রচুর ভারতীয় মুসলমান এখন বিদেশে গিয়ে ব্যাপকভাবে কাজকর্ম করে জীবনযাপন করছে। এর ফলে তাদের জীবনস্তরও অনেকটা উন্নত হয়েছে। কিছুদিন আগে ঘটে যাওয়া আমেরিকার 'খেরাবগরে' বিষয়টি খুব আলোচিত হয়েছিল। যার থেকে একটা বিষয় স্পষ্ট হয়ে যায় যে ভারত সরকার এবং শিক্ষিত ভারতীয়রা নিজেরাও নিজেদের হিতের জন্য বিদেশে লড়াই করে। কিন্তু আরব দেশগুলিতে যদি দৃষ্টি দেওয়া যায় তবে দেখব আজও তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর ভারতীয় মুসলমানরা আরবে গিয়ে পরিশ্রম করে নিজেদের খাবার জোগাড়ের চেষ্টা করে। তাদের জীবনস্তর যাতে উন্নত হয় তার জন্য তারা যে শুধু যেকোনো রকম কাজ করতে রাজি হয় তাই নয় প্রয়োজন হলে তারা আইনি লড়াইও করে। আমেরিকা, ইউরোপের সরকার তো ভারতীয়দের কথা শোনে কিন্তু আরবদেশগুলির সরকার এখনও তাদের গুরুত্ব দেয় না। আজও আরবের যে কোনো মুসলমানকে জিজ্ঞেস করলেই তারা 'হায় তোবা'! করে উঠে। তারা ভারত সরকারকে অভিযোগও জানায়, কিন্তু আঙুল তো সেইসব নেতা ও সংগঠনের দিকে ওঠে যারা দিন-রাত ইসলামিক ভ্রাতৃত্বের কথা বলে। সেইসব মৌলানা এবং রাজনেতাদের জিজ্ঞাসা করা দরকার যারা মঞ্চে বসে ভারত সরকার এবং এখানকার সামাজিক সংগঠনগুলির বিরুদ্ধে অনর্গল প্রচার করতে এবং ভারতীয় নেতাদের বিরুদ্ধে বিষোদগার করার কোনোরকম সুযোগ হাতছাড়া করে না। হজযাত্রীদের সঙ্গে যাওয়া মুসলমান নেতা এবং সামাজিক কার্যকর্তাদের প্রতিনিধিরা কি করে? ভারতে তো এইসব নেতারা নিজেদের বিরোধীদের বিরুদ্ধে ক্রমাগত বিদ্বেষ ছড়িয়ে যায়, কিন্তু ইসলামি দেশগুলিতে ভারতীয় মুসলমানদের সঙ্গে যে অন্যায় হয় তার উপর তারা কোনো কথা কেন বলে না? মুসলমান বন্ধুত্ব এবং ইসলামিক ভ্রাতৃত্ববোধের কথা তখন কেন ওঠে না? ভারতের মুসলমান এবং তাদের সমর্থক রাজনৈতিক দলও এই সব ব্যাপারে

> **দুঃখের কথা, ভারতের কোনো মুসলমান সংগঠন বা মুসলমান তোষণকারী কোনো রাজনৈতিক দল সংসদ ভবন থেকে শুরু করে রাস্তায় কোথাও এই নিয়ে (আরব দেশগুলিতে ভারতীয় মুসলমানদের উপর অত্যাচার) টুঁ শব্দ পর্যন্ত করে না। মুসলমান সংগঠনগুলো এইসব দেশ থেকে এত অর্থ পায় যে তারা এই তথ্য বাইরে আনতে পারে না।**

অন্য দেশে কাজ করতে যাওয়া ভারতীয় মুসলমানদের পরিসংখ্যান

মুসলমানদেশ	২০১১	২০১২	২০১৩	২০১৪
সৌদি আরব	৩,৬৬৫	৪২৯২	২৩৬৭	২২২০
কুয়েত	৩৮৫৪	৩৫৯৩	২৮৮৭	৭৭৪
কাতার	৩৮৬	৩৩৮৫	৩১৫	পাওয়া যায়নি
আম্মান	২৮৮৯	২৩৬১	১৭৮১	১১৪৫
আরব আমিরশাহি	২১৮৪	১৭৫৮	১৭৮১	১৩৪৬
বাহারিন	১১৫৮	৮৬৫	৮২৮	৮৫৬
জর্ডন	১	১	১১	১৩
ইয়েমেন	১০	—	১৭	৬
ইরান	২২	৩৪	৫৭	৪৯

কেন নিজেদের দায়িত্ব পালন করে না?

যে কুয়েতের প্রশংসায় এখানকার মুসলমানবন্ধুরা পঞ্চমুখ সেখানে ভারতীয় মুসলমানরা কেবল সার্বজনিক অত্যাচারের শিকার। প্রত্যক্ষ অভিযোগ তো অনেক দূরের কথা ভারত সরকারের কাছে পাঠানো অভিযোগ বিচার করলেই পরিস্থিতি কতটা ভয়াবহ বোঝা যায়। তবে কী রকম বর্বর ব্যবহার করে তার অনেক উদাহরণ আপনারা হয়তো শুনে থাকবেন। কুয়েতের মালিক তার কর্মচারীর সঙ্গে কী ব্যবহার করে তা কল্পনা করাও কঠিন। এখানে ভারতীয় মুসলমানদের প্রতারিত করার এবং তাদের শারীরিক অত্যাচারের ঘটনার বিবরণ দেওয়া হচ্ছে না। আমরা এই তথ্য দিয়ে এটা বোঝাবার চেষ্টা করছি যে যারা দুনিয়াকে সুরক্ষা ও সমানতার ধর্মের কথা বলে সেখানে তারা নিজেদের ধর্মের লোকেদের সঙ্গে কী বর্বর ব্যবহার করে।

এদের সংখ্যা শয়ে নয় বরং হাজারে বা লাখে। দুঃখের কথা, ভারতের কোনো মুসলমান সংগঠন বা মুসলমান তোষণকারী কোনো রাজনৈতিক দল সংসদ ভবন থেকে শুরু করে রাস্তায় কোথাও এই নিয়ে (আরব দেশগুলিতে ভারতীয় মুসলমানদের উপর অত্যাচার) টুঁ শব্দ পর্যন্ত করে না। মুসলমান সংগঠনগুলো এইসব দেশ থেকে এত অর্থ পায় যে তারা এই তথ্য বাইরে আনতে পারে না। কিছু রাজনেতা এবং মৌলানা তো প্রথমবার হজযাত্রাতেই বিক্রি হয়ে যায়। আপনারা কি বিশ্বাস করতে পারবেন যে আমাদের সরকার এবং এইসব সামাজিক সংগঠনগুলোর কাছে প্রতিদিন খোদ ভুক্তভোগীদের শয়ে শয়ে অভিযোগ জমা পড়ে। ভারতীয় দূতাবাসে কেবল গত চার বছরে সৌদি আরবে ১২৪৯৫১টি অভিযোগ জমা পড়েছে। এছাড়াও কুয়েতে ১২১১০, কাতারে ৯৮৭৬, আকরানে ১৮৭৭, আরব অমিরশাহিতে ৬২১২, বাহারিনে ৩৫৭৭, জর্ডনে ২৬, ইয়েমেনে ২৩ আর ইরান থেকে ১৬২ ভারতীয় মুসলমানদের অভিযোগ জমা পড়েছে। এই সংখ্যা কেবল সরকারি তথ্য অনুসারে, কিন্তু যারা অভিযোগ করে না তাদের সংখ্যা দ্বিগুণ হলে আশ্চর্যের কিছু নেই। এদের শুধু পাসপোর্ট বাজেয়াপ্ত করে দেওয়া হয় তাই নয় বরং এদেরকে কীভাবে শাস্তি দেওয়া হয় তা শুনলে চমকে উঠতে হয়। বেতন না পাওয়া বা সময়মতো বেতন না পাওয়া সাধারণ ঘটনা, কিন্তু তাদের উপর শারীরিক ও মানসিকভাবে যে অত্যাচার করা হয় তার বিবরণ শুনলে যে কারোর চোখে জল আসবে। চাকরিতে রাখার সময় তাদের সঙ্গে অনেক রকম সুযোগ সুবিধা দেওয়ার কথা হয়। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে ওষুধ তো দূরের কথা দু'বেলা পেটভরে খেতে পর্যন্ত দেওয়া হয় না। যে ভারতীয় মুসলমানরা অবৈধভাবে গিয়ে ওইসব জায়গায় কাজ করে তাদের শাস্তিস্বরূপ মাসের পর মাস ঘরে বন্ধ করে রাখা হয়। তাদের উপর হওয়া অত্যাচারের ঘটনাতো বার বার সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশ পায়। ভারত সরকারের কাছে জমা হওয়া অভিযোগের তথ্য প্রকাশ করাই আমাদের উদ্দেশ্য। এইসব দেশ থেকে পাওয়া ভারতীয় মুসলমানদের অভিযোগের সংখ্যা এখানে দেওয়া হচ্ছে। ভারতের যে শ্রমিক বা কর্মচারী অভিযোগ জানায় তাকে সেই দেশ আর ভিসা দেয় না।

ভারতীয় মুসলমানরা কেবল আরবের দেশগুলিতে গিয়ে কাজ করে এমন নয়। প্রকৃত সত্য এই যে ভারতীয়রা রোজগারের জন্য পৃথিবীর সমস্ত দেশেই ছড়িয়ে আছে। এইরকম দেশের সংখ্যা প্রায় ১২২। বিদেশে গিয়ে কাজ করা ভারতীয়দের সংখ্যা বিশাল। আমরা ওইসব দেশের তথ্যই দিয়েছি যেসব দেশ থেকে অভিযোগ ভারত সরকারের কাছে জমা পড়েছে। এটা নিশ্চিত যে ভারত সরকার ওইসব দেশের সঙ্গে কথা বলে কিন্তু তার পরিণাম কী হয় তার কোনো তথ্যই ভারত সরকার কখনো প্রকাশ করে না।

সবার প্রিয়
বিল্লদা
চানাচুর
'বিল্লদাকুঞ্জ'
কালিকাপুর, বোলপুর,
জেলা : বীরভূম
ফোন : ০৩৪৬৩ ২৫২৪৪৭
মো : ৯৪৩৪৩০৬৭৯৬ / ৯২৩৩১৮৯১৭৯

চিঠিপত্র

লোকসভা নির্বাচনে বিপুল ভোটে জিতে বিজেপি-র কি লাভ হলো?

গত লোকসভা ভোটে বিজেপি আশাতীত সাফল্য পেয়েছে। ৫৪৪ আসনের মধ্যে বিজেপি একাই ২৮২টি আসন জিতে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছে। এনডিএ-র অন্যান্য শরিক দল মিলে মোট ৩৩৫ আসন পেয়ে লোকসভায় বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছে।

এই বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে লোকসভায় জিতে দিল্লীতে ক্ষমতায় এসে বিজেপি-র লাভ কি হয়েছে? বিজেপি-র ঘোষিত নীতি ছিল— (১) সারা দেশে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি চালু করা। (২) ৩৭০ ধারা বিলোপ করা। (৩) অযোধ্যায় রাম মন্দির নির্মাণ করা। (৪) কাশ্মীর উপত্যকা থেকে বিতাড়িত হিন্দু পণ্ডিতদের স্বভূমিতে পুনর্বাসন দেওয়া। (৫) দেশ থেকে দুর্নীতির মূলোৎপাটন করা। (৬) বেকার সমস্যার সমাধান করা। (৭) মূল্যবৃদ্ধি রোধ করা। (৮) দেশের সর্বিক উন্নয়ন এবং (৯) বিদেশের ব্যাঙ্কে ভারতীয়দের গচ্ছিত কালো টাকা উদ্ধার করা ইত্যাদি।

প্রথমেই দেখা যাচ্ছে প্রথম তিনটি অর্থাৎ সারাদেশে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি চালু করা, ৩৭০ ধারা বিলোপ এবং অযোধ্যায় রাম মন্দির নির্মাণ-এর কর্মসূচি বিজেপি পুরোপুরি বাদ দিয়েছে। ৪নং বিষয় অর্থাৎ উদ্বাস্তু কাশ্মীরি পণ্ডিতদের স্বভূমিতে পুনর্বাসন দেওয়ার প্রয়াস অবশ্য চালিয়ে যাচ্ছে। সেজন্য ৫০০ কোটি টাকার বাজেট বরাদ্দ করেছে। কিন্তু তাদের সে প্রয়াস কতখানি পূর্ণ হবে তাতে সংশয় দেখা দিয়েছে। কারণ এই পুনর্বাসন সম্পূর্ণ নির্ভর করছে কাশ্মীর সরকারের উপর। তারা জমি অধিগ্রহণ করে দিলেই তবে এই পুনর্বাসন প্রকল্পটাই গড়ে ওঠা সম্ভব। কিন্তু এ পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে কাশ্মীরের মুফতি সরকার এইভাবে কাশ্মীরি পণ্ডিতদের পুনর্বাসন দিতে অনিচ্ছুক। অধিকন্তু কাশ্মীরের বিচ্ছিন্নতাবাদীরা এবং সীমান্তে ওপারের জঙ্গিরা এই পুনর্বাসনের ঘোর-বিরোধী। তারা এর বিরুদ্ধে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে। কেন্দ্রের সদিচ্ছা থাকলেও এইসব বাধা অতিক্রম করে ঘরছাড়া কাশ্মীরি পণ্ডিতদের পুনর্বাসন কতদূর সাফল্য পাবে তা সন্দেহের বিষয়।

অন্যগুলি অর্থাৎ বিদেশের ব্যাঙ্কের কালোটাকা উদ্ধার ও দুর্নীতি দমনের চেষ্টা অবশ্য চলছে। বেকার সমস্যা সমাধানের কোনো বাস্তব প্রচেষ্টা চোখে পড়ছে না। উন্নয়ন প্রয়াস অবশ্য চলছে। আগের সরকারের আমলেও চলত। এতে কোনো নতুনত্ব নেই।

অন্যদিকে দেখা যাচ্ছে লোকসভায় বিপুল সংখ্যাধিক্য পেয়েও বিরোধী দলগুলি বিশেষত নির্বাচনে গোহারা কংগ্রেসের ভাইস-প্রেসিডেন্ট রাহুল গান্ধী বিভিন্ন ইস্যুতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তথা বিজেপি-র দিকে ক্রমাগত তোপ দেগেই চলেছেন। দেখে বোঝা যাচ্ছে না যে কে বিপুল ভোটে জিতে দেশের শাসনকার্য চালাচ্ছেন, আর কে গোহারা হেরে বিরোধী আসনে বসে আছেন। আর ভোটে জিতে যদি হেরোদের এমন আক্রমণের মুখে চুপ করে থাকতে হয় তা হলে এত কাঠখড় পুড়িয়ে ভোটে জিতে লাভ কি হলো?

সব থেকে বিস্ময়ের বিষয় হলো আমাদের ২৪ ঘণ্টা শুনতে হচ্ছে--- লোকসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ হলেও বিজেপি রাজ্যসভায় সংখ্যালঘু। আর রাজ্যসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ বিরোধীদের সম্মতি ছাড়া কোনো বিলই আইনে পরিণত করা সম্ভব নয়। যেমন জমি অধিগ্রহণ বিল। লোকসভায় পাশ হলেও রাজ্যসভার বিরোধীরা এতে কোনোক্রমেই সম্মতি দেবে না। সেজন্য বিজেপির পক্ষ থেকে শুরু হয়েছে রাজ্যসভায় বিরোধীদের মন পাওয়ার জন্য সব রকম তদ্বির তদারক। আবার বিভিন্ন বিলে তাঁর সম্মতির আশায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তথা বিজেপি-র ঘোর বিরোধী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে পাশে পাওয়ার মরিয়া প্রচেষ্টা। হায়! লোকসভায় একক ভাবে এবং এনডিএ-র অন্য শরিকদের নিয়ে এত বিপুলভাবে জিতে যদি রাজ্যসভার আপত্তিতে কোনো আইন পাশ না করা যায় তবে লোকসভায় ভোটে জিতে লাভ কি হলো?

এই রাজ্যসভা আর কিছুই নয়, বিধান পরিষদের মত পরোক্ষ নির্বাচিতদের একটি মঞ্চ। পশ্চিমবঙ্গে এক সময়ে জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে হারলেও তাঁদের এই পরোক্ষ নির্বাচনের দ্বারা বিধান পরিষদে পুনর্বাসন দেওয়া হতো। এঁদের কেউ কেউ মন্ত্রীও হতেন। বিরোধীরা তাদের ব্যাকডোর বা পিছনের দরজা দিয়ে প্রবেশ করা মিনিস্টার বলতেন। পরে অবশ্য এই অনাবশ্যক বিধান পরিষদ উঠিয়ে দেওয়া হয়। অথচ দেখা যাচ্ছে যে এই পরোক্ষভাবে নির্বাচিত এমপি-দের রাজ্যসভায় কী দাপট, তাঁদের সম্মতি ছাড়া জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিতদের কোনো আইন পাশ করার কোনো ক্ষমতাই নেই। অবিলম্বে এই রাজ্য সভার বিলুপ্তি না ঘটলে জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত পার্লামেন্টিয়ানদের কোনো ক্ষমতাই থাকবে না যেমন এক্ষেত্রে বিজেপি-র হয়েছে।

পরিশেষে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী মজে রয়েছেন শুধু উন্নয়নে। তা তিনি থাকুন তবে তাঁর মনে রাখা উচিত যে শুধু উন্নয়নের জন্য দেশের বিপুল সংখ্যক জনসাধারণ তাঁকে বা তাঁর দলকে বিপুল সংখ্যাধিক্যে নির্বাচিত করে লোকসভায় পাঠায়নি, প্রায় হাজার বছর ধরে প্রথমে মুসলমান ও পরে ইংরেজরা ভারতের হিন্দুদের উপর যে স্টীমরোলার চালিয়েছিল, হাজার হাজার মন্দির ধ্বংস করেছিল, কোটি কোটি লোককে ধর্মান্তরিত করেছিল তার প্রতিকারের আশায় তারা ব্যাপকভাবে বিজেপিকে জয়ী করেছিল। তাদের সে আশায় জল ঢেলে দিয়ে শুধু উন্নয়নের স্বপ্ন দেখালে ভোটে

জেতা যাবে না। মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার— যাঁর সর্বপ্রথমে নিজের চরকায় তেল দেওয়া উচিত ছিল— ভারতের অভ্যন্তরীণ অবস্থা নিয়ে টিপ্পনীতে প্রভাবিত না হয়ে—প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর উচিত হবে দলের প্রধান কর্মসূচি মেনে চলা।

—**সুহাস বসু,**
কলকাতা—৬০।

মোদীর সাফল্য

'কঠোর সমালোচককেও মেনে নিল মোদীর সাফল্য' ২৫/৫/১৫- এর স্বস্তিকায় প্রকাশিত সংবাদ প্রতিবেদন পড়ে জানা গেল টাইমস্ অব্ ইন্ডিয়া গোষ্ঠীর সমীক্ষা অনুযায়ী মোদী সরকারের একবছরে কাজের সাফল্য সামগ্রিকভাবে বেশ ভালো। যদিও উচ্চ আশা অনুযায়ী তা হয়নি। না হওয়ারই কথা। তার কারণ একাধিক।

ভারত আসলে মূর্খামি করে তিনটি দেশের উন্নয়নের দায়ভার নিয়ে বসে আছে স্বাধীনতার পর থেকে। ভারতের নিজের, পাকিস্তানের আর বাংলাদেশের, একটু চিন্তা করলেই ব্যাখ্যা পেয়ে যাবেন। কিন্তু এ সবের পরেও অপদার্থ সংসদীয় গণতান্ত্রিক কাঠামোর জন্য কোয়ালিশন বা মিলিজুলি সরকার বার বার ভেঙে যাওয়ার ফলে উন্নয়ন পিছিয়ে যাওয়া ছিল অন্যতম প্রধান কারণ, যেমনটা হয়েছিল ১৯৮০ থেকে ১৯৯০-এর সময়কালে। জানা যায় চীনও ১৯৮০-র দশক পর্যন্ত ভারতের থেকে পিছিয়ে ছিল; ১৯৮৫ থেকে ১৯৯৫ সাল পর্যন্ত সময়কালে চীন ভারতকে ছাড়িয়ে যায় এবং তারপর থেকে দ্রুত এগোতে থাকে। এই সময়ে সমাজতান্ত্রিক কাঠামো সরিয়ে ধনতান্ত্রিক কাঠামো প্রয়োগ করেই সাফল্য পায় 'মেক ইন চায়না' কর্মসূচি সফল করে। আর ভারত কারগিল যুদ্ধ সামলে, পারমাণবিক বোমা পরীক্ষা করার ফলে আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞার মোকাবিলা করে, দেশব্যাপী সীমাহীন দুর্নীতি সহ্য করে কয়েকবার কোয়ালিশন সরকার ভাঙার ক্ষতি সামলেও বাজপায়ী সরকার যখন দেশকে উন্নয়নের সাফল্য দিতে শুরু করেছিল, তখনই তার সরকারের মেয়াদ শেষ হয়েছিল। দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় না ফিরতে পারার ফলে আবার উন্নয়ন পিছিয়ে যায়। আড়াই-তিন বছর পরেই অধিকাংশ মানুষ বলতে শুরু করেছিল 'বিজেপি সরকারই ভালো ছিল'। তা সত্ত্বেও ইউপিএ সরকারকে পাক্কা দশটি বছর সময় দিয়ে ধৈর্য ধরেছিল দেশবাসী। আজকে গাছ লাগিয়ে দু-তিন মাস পরেই ফল খাবার আশা করলে তাহলে ঋতুভিত্তিক ফসল যেমন লাউ, কুমড়ো, সর্ষে, মুসুর প্রভৃতির চাষ করতে হয়, কিন্তু সে ফসল তো একবারই পাওয়া যাবে, বাগিচা ফসলের মতো নয়। এইরকম সস্তা উন্নয়ন করে সাধারণের লাভ হবে না। দীর্ঘদিন পুষে রাখা শীর্ণ রোগীর রোগ নিরাময়ের জন্য ডাক্তার যখন দীর্ঘ চিকিৎসা বা অপারেশনের জন্য বহু টাকার প্যাকেজ ধরিয়ে দেন, তখন আমরা খেয়ে-না-খেয়ে ঐ চাপ নিতে রাজি হই, কারণ তা না হলে রোগ সারবে না, আপনার মানুষটি বাঁচবে না। আবার রোগী বা তার আত্মীয় যদি ওই চাপ নিতে রাজি না হন তাতে ডাক্তারের কিছু যায়-আসে না। নিজের পুত্র-কন্যাকে স্কুলে ভর্তি করেই আমরা এক-দুবছর পরেই তার কাছ থেকে কিছু রিটার্ন আশা নিশ্চিত করি না। আমরা প্রায় ১৫/১৭ বছর ধরে তার ভবিষ্যৎ গড়ার কাজে ইনভেস্ট করার চাপ নিয়ে থাকি আবার সময়ও দিই। তারপর আশা করি সুখের দিনের।

দেশের রোগটিও আগেকার অভিভাবকরা পুষে রেখে দূরারোগ্য করে রেখেছে। দেশবাসীকে একটু বাড়তি চাপ এবং বেশি সময় দিতেই হবে— এই সত্যটি বুঝতে হবে। অভিভাবকদেরও দেশবাসীকে তা সরলভাবে ব্যাখ্যা করে বোঝানোর দায় আছে। অন্যথায় বাজপেয়ী সরকারের পরের সরকারের আমলের মতো একইভাবে দুঃখ করে বলতে হবে 'মোদী সরকারের সময় দেশ ভালোই এগোচ্ছিল!'

—**টিমিড পেনস্পিকার,**
কল্যাণী, নদীয়া।

যত মত তত পথ

গত ২০ এপ্রিল সংখ্যায় শবরী ঘোষ-এর লেখা প্রবন্ধ 'শাশ্বত জীবনমূল্যবোধের নাম গীতা' এবং ২৪ মে সংখ্যায় প্রকাশিত বিনয়ভূষণ দাশ-এর প্রবন্ধ 'সংবিধানের প্রস্তাবনায় 'সমাজতন্ত্র' ও 'ধর্মনিরপেক্ষতা'— বৈধ অথবা অবৈধ' দুটিতেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, রামকৃষ্ণদেব বলেছেন, 'যত মত তত পথ'। বিষয়টি নিয়ে আমার কিছু বক্তব্য আছে।

রামকৃষ্ণদেব বলেছেন, 'অনন্ত মত অনন্ত পথ। আমার পথ ঠিক আর সকলের মিথ্যা— এরূপ বোধ যেন না হয়। বিদ্বেষভাব যেন না হয়।' (কথামৃত ৫২৩ পৃ.) তাঁর এই বক্তব্য থেকে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে তিনি পরধর্ম ও পরমত অসহিষ্ণুতাকে সমর্থন করছেন না। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, 'মুসলমান আক্রমণ- তরঙ্গ ভারতে আসিবার পূর্বে এদেশে ধর্মের জন্য নির্যাতন কী তাহা কেহ কখনও জানিত না। যখন বিদেশিরা এই নির্যাতন হিন্দুদের উপর আরম্ভ করিল, তখনই হিন্দুদের এ বিষয়ে অভিজ্ঞতা হইল।' (বাণী ও রচনা ৩য় খণ্ড ১৫৪ পৃ.)

এখন উপরের দুটি বক্তব্যের পাশে যদি 'যত মত তত পথ'কে রাখা যায় তা হলে দেখা যাচ্ছে যে, যারা পরমত ও পরধর্ম বিনাশকারী তারাও যেমন সত্য; তেমনি তারাও সমানভাবে সত্য যারা পরমতসহিষ্ণু। বিষয়টা স্ববিরোধী এবং গোলমেলে।

'যত মত তত পথ' এই কথাটা লেখকদ্বয় কোথা থেকে পেলেন? আমি কথামৃত তন্নতন্ন খুঁজেও এর অস্তিত্ব পাইনি। লীলা প্রসঙ্গেও এর উল্লেখ নেই। স্বামী বিবেকানন্দের দশ খণ্ড রচনাবলীতেও ঘুণাক্ষরেও এই কথাটার উল্লেখ নেই। উল্লেখ নেই মা সারদামণির কোনো বক্তব্যে। সুতরাং এই দুই লেখককেই আমার অনুরোধ 'যত মত তত পথ' কথাটা কোন গ্রন্থের কত পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে সেটা দয়া করে জানান।

—**প্রভাত কুমার মণ্ডল,**
ফুলেশ্বর, হাওড়া।

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের মুখপত্র

প্রণব

পড়ুন ও পড়ান

মেমারীর সোমেশ্বরনাথের বিরল রজত মূর্তি

দেবপ্রসাদ সরকার

ভারতবর্ষ মন্দিরময় দেশ। কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী পর্যন্ত মন্দিরে মন্দিরে ছয়লাপ। ভারতবর্ষ দেবভূমি বলে পরিচিত। বিভিন্ন মন্দিরে মুঘল আমলে অত্যাচার ও লুণ্ঠনের ফলে অনেক প্রাচীন মন্দির আজ অবলুপ্তির পথে। সোমনাথের মন্দির অত্যাচারী নাদির শাহের আক্রমণে ও লুণ্ঠনে জরাজীর্ণ হয়েছিল, পরে সেটিকে ভক্তদের চেষ্টায় পুনর্গঠনের ফলে পূর্বাবস্থায় ফিরে এসেছে।

এইরকম একটি প্রাচীন মন্দির ও বিগ্রহের কথা যেটা প্রায় লোকচক্ষুর অন্তরালে রয়ে গেছে। মন্দিরের কাহিনি কিংবদন্তী হলেও বর্ধমান কোর্ট দ্বারা তা স্বীকৃত। প্রথমে গ্রামটির নাম ছিল মহবতপুর, বর্ধমান রাজার অধীনে।

সেই সময় এক কিশোর নিজ গ্রাম কাটোয়ার শ্রীখণ্ড থেকে নিজের পৈতৃক যাবতীয় ত্যাগ করে একাকী পদব্রজে বর্ধমান এসে মহারাজের নজরে পড়ে। পরে সে রাজবাড়ির একজন হয়ে যায়। তার শ্রীখণ্ডের বাড়িতে প্রাচীন দুর্গাপূজা ছিল। যাইহোক, সে একদিন রাতে স্বপ্ন দেখে শিবঠাকুর বলছেন যে তিনি বর্ধমান থেকে ১৯ মাইল পূর্বে মহবতপুর নামক এক প্রত্যন্ত গ্রামে মাটির নীচে আছেন। তাঁকে তুলতে হবে। রাজবাড়ির সেই কিশোর ততদিনে যুবক। নাম অযোধ্যারাম সরকার। তিনি সকালে উঠে রাজাকে সকল বৃত্তান্ত বলতে রাজা লোকলস্কর কোদাল শাবল দিয়ে উক্ত স্থানে পাঠিয়ে দিলেন। অযোধ্যারাম কোনোরকমে উক্ত স্থানে পৌঁছলেন। কারণ জিজ্ঞাসা করার কোনো লোকও ছিল না। দূরে নিম্নবর্গের কয়েকঘর লোকের বাস ছিল। তাদের জীবিকা ছিল চাষ আবাদ। কারণ তখন জমি ছিল প্রচুর তার তুলনায় লোকসংখ্যা ছিল নেহাতই নগণ্য।

অয়োধ্যারাম খুঁজে খুঁজে বনে মধ্যে একস্থানে গিয়ে দেখলেন একটি কালো গাই-য়ের বাঁট থেকে অনর্গল দুধ পড়ে যাচ্ছে। স্বপ্নে যেমন দেখেছিলেন ঠিক তেমনই। লোকজন নিয়ে জায়গাটা খোঁড়াখুঁড়ি করতেই বর্তমানের মেমারী সোমেশ্বর তলার শিব মন্দিরের শিবলিঙ্গ প্রকাশ পেল।

রাজানুকূল্যেই দুবেলা সেবা-পূজা অযোধ্যারামের তত্ত্বাবধানে চলছিল। বলাবাহুল্য, বর্ধমানরাজ এই জন্য বেশকিছু জমি জায়গা দিয়েছিলেন। প্রথমে ওই মন্দির ছিল খড়ের চালের, পরে উত্তর পুরুষের ভোলানাথ সরকার তা পাকা করেন। বিচিত্র কারুকার্যও করা হয় ১৭৬১ শকাব্দে। মন্দিরের পশ্চিমগাত্রে লেখা আছে :

'শাকে বোমাস্ট মাসাঙ্গধ ধরণী বিমিতে বিশ্বমহানুকম্পা ভোলানাথস্ব পুত্রেন শশী বিভূতিদায়ী সোমেশ্বরায় তস্য প্রপৌত্র পুত্রেণ চ গুণবহতা কালিকানন্দ নাম্না প্রাসাদোহকারী রক্ত শশিরস বনিতা বিগ্রহাঙ্কে শকাব্দে।

১৬৮০ শকাব্দ— ১১৬৫ সাল— ১৭৫০-৬০ সাল খৃষ্টাব্দ যোড়শ অশিতি অব্দে প্রায়ত বৎসরে, অনুকম্পা জনিত অদ্য চরণম সোমেশ্বরে। দিয়াছেন ভোলানাথ সরকারের পুত্র। করেন কালিকানন্দ তাহাতে বিচিত্র। সপ্তদশ একঘণ্টা অব্দ পরিমাণে, বোধের বিশয় হয় অক্ষর পঠনে— ১৭৬১ শকাব্দ।' এই লিপিতে যতগুলি নাম আছে তারা সকলেই অযোধ্যা রায়ের উত্তরপুরুষ। এই মন্দিরের বর্তমান বয়স ২৫৭ বৎসর। এই জায়গার পূর্ব নামছিল মহবতপুর। নামটির মধ্যে ইসলামের সংস্পর্শ থাকায় উত্তরপুরুষের একজন শ্যামানন্দ সরকার বর্ধমান রাজার নিকট এই নাম পরিবর্তনের অনুরোধ করায়, রাজা বিজ্ঞজনেদের জানান। তখন মহবতপুর ছিল বিশাল কৃষিজমির অন্তর্ভুক্ত।

কৃষিপ্রধান অঞ্চলকে আরবি ভাষায় বলে মামুরী, ওই নামের অপভ্রংশ করে মেমারী করা হয়।

সেই থেকে সোমেশ্বরনাথের সেবা-পূজা চলে আসছে। সোমেশ্বরনাথ নামকরণের একটি ব্যাখ্যা আছে। যেদিন বিগ্রহ অযোধ্যারামের হাতে উত্থিত হয় সেইদিনটা ছিল সোমবার। তাই রাজা নামকরণ করেন সোমেশ্বরনাথ।

প্রতি চৈত্র মাসের শেষের দিকে ৫ দিন ধরে খুব ধুমধাম সহকারে গাজন উৎসব পালিত হয়। ১৮/২০ জন সন্ন্যাসী হয়। ছোট একটি শিবলিঙ্গকে পালকিতে সাজিয়ে সন্ন্যাসীগণ কাঁধে করে গ্রাম প্রদক্ষিণ করে। বেলা ১২টার সময় রওনা দিয়ে রাত্রি ৯টায় ফেরে। গ্রামের প্রায় প্রত্যেক পরিবার পুজো দেয়। এরূপ চলে তিনদিন। তৃতীয়দিন অর্থাৎ নীলের দিন থেকে আর যায় না। এদের মধ্যে একজন মূল সন্ন্যাসী থাকে।

মূল সন্ন্যাসী একটি বাড়ির যেকোনো একজন হয়। সোমেশ্বরনাথ প্রকাশ পাওয়ার পূর্বে যে কালো গাই-য়ের বাঁট থেকে অনর্গল ধারায় দুধ নির্গত হচ্ছিল সেই গাইটি ছিল বাগ্‌দি বা বাগ সম্প্রদায়ের বাড়ির। সেইজন্য রাজার নির্দেশক্রমে ওই বাড়ির একজন প্রতিনিধি মূল সন্ন্যাসী হবে। সেই নির্দেশ আজও অক্ষরে অক্ষরে পালিত হয়ে আসছে। কিছুকাল পর থেকে সেই স্থানের এক ব্রাহ্মণ পরিবার পূজা, নিত্যসেবা ও শীতল আরতি করে আসছেন।

বিগ্রহের কাছে মানসিক করে সফল হওয়ায় তারা নানাপ্রকার অলঙ্কার প্রদান করেছেন। সবই সোনা রুপার। রুপার খড়ম বেশ কয়েকজোড়া। সোনার খড়ম, সোনার আকন্দমালা, সোনার রুদ্রাক্ষমালা, বিল্বপত্র, অর্ধচন্দ্র লকেট আরও অনেককিছু। সেবাইতগণের নিকট অর্থাৎ অযোধ্যারামের বংশধরের নিকট সেই গহনা যতদিন ছিল সবই ছিল। কিন্তু বর্তমানে নীলের দিন ও ফলের দিন ঠাকুরের তিনফুট আন্দাজ রজত মূর্তি বসানোর সময় যা দেওয়া হয় তা খুবই নগণ্য। রজতমূর্তি রক্ষিত থাকে বর্তমানের সরকার বাড়িতে। আর গহনা থাকে পূজারি গঙ্গোপাধ্যায়দের বাড়িতে। সবই বের করা হয় গাজনের দুদিন। সেবাইত সরকার বাড়ি থেকে রজত মূর্তি লিখিত শর্তে নিয়ে এসে দুদিন ভক্তদের দর্শনের পর নীলের দিন রাতে আবার সেবাইত সরকারদের বাড়িতে ফেরত দিয়ে আসে। এই ভাবেই চলে আসছে দীর্ঘ কয়েকবছর।

প্রথমদিন রুপার মূর্তি ঘাড় থেকে মাথাপর্যন্ত মাথা বসানো হয়, তারপর পূর্ণায়বব মূর্তি বসানো হয়।

মেলাতে নানাপ্রকার দোকান বসে। খাবার জিনিসের মধ্যে বাদামভাজা, জিলাপি, এগরোল, মোগলাই, কুলপি মালাই ইত্যাদি। আর ছোটোদের খেলনা দ্রব্যের মধ্যে নানা ধরনের কমদামি দামি বিভিন্ন রকমের খেলনা। থাকে নাগরদোলাও। ছেলেবুড়ো সকলেই গ্রীষ্মের সময় নাগরদোলায় চেপে আনন্দ উপভোগ করে।

যে কদিন সন্ন্যাসীরা পালুনি করে সে কদিন তারা যে জাতেরই হোক না কেন ব্রাহ্মণ কর্তৃক উপবীত ধারণ করে শিবগোত্রে পরিচিত হয়। চৈত্রমাসের শেষ দিন তারা অনেক উচুঁ থেকে ঝাঁপ দেয়। তারপর নানাপ্রকার নিয়ম পালনের পর ব্রাহ্মণ তাদের সেই উপবীত খুলে দেন। পয়লা বৈশাখ থেকে ওরা আবার স্বাভাবিক জীবন যাপন করে।

সোমেশ্বরনাথের কিছু কিছু অলৌকিকত্ব আছে, বিশেষ করে রোগ ব্যাধি ভালো হওয়ার ব্যাপারে। অনেকে মানসিক করে উপকার পেয়েছে তা সর্বস্বীকার্য।

ভারতবর্ষ মন্দিরময় দেশ প্রতিটি রাজ্যেই শিবমন্দির আছে, কিন্তু বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠানে মেমারীর সোমেশ্বরতলার শিবমন্দিরের মতো বিরল সুন্দর মনোহর দৃষ্টিনন্দন রজতমূর্তি কোথাও পরিলক্ষিত হয় না। শুধু তাই নয়, ওই প্রকার রজতমূর্তি যে মেমারী ছাড়া কোথাও নেই তা হলফ করে বলা যায়। অথচ প্রচার নেই বলে ওই মন্দির এবং মূর্তির কোনোপ্রকার আলোকপাত করা হয়ে ওঠেনি এতকাল। ■

Swachchha Bharat   Swabolombee Bharat

How to build a nice home, think of us

WE PROVIDE :-

+ Low Cost readymade Latrine (Toilet) + Low Cost House
+ Low Cost Domestic Dustbin & Domestic Biogas Plant
+ Heat & Waterproof Solution for your heated roof.

Contact

ABC ENGINEERS & SERVICES

"PARK PLAZA" Room No. 11 & 12, 71, Park Street, Kolkata - 700 016
98311 85740, 98312 72657,Visit Our Website : www.calcuttawaterproofing.com

এরই নাম প্রেম !

শবরী ঘোষ

সম্প্রতি কয়েকজন তথাকথিত বুদ্ধিজীবী এবং কয়েকটি প্রগতিশীল পত্রপত্রিকা মত প্রকাশ করেছে যে, 'লাভ জিহাদ' কেবলমাত্র কয়েকটি হিন্দু সংগঠনের উদ্ভাবিত একটি মনগড়া তত্ত্ব। ভারতের মতো উদার ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্রের অধিবাসীরা ধর্মান্তরকরণের অস্ত্র হিসাবে নাকি 'প্রেম'-কে কখনোই ব্যবহার করে না। প্রকৃতপক্ষে তাদের ওই চিন্তাধারা যে কতখানি অসার তা গত ফেব্রুয়ারি মাসে অসমের একটি ঘটনা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে। অসমের বাসিন্দা শামির রহমান ও রুশ তরুণী এক্যাটরিনা রেইজচিকোভার তথাকথিত প্রেম শুরু হয় মস্কোর এক কলেজে ডাক্তারি পড়ার সময়। শামির এক্যাটরিনাকে বিবাহের প্রতিশ্রুতি দেয়। ফেব্রুয়ারির প্রথমে তারা ভারতে আসার সিদ্ধান্ত নেয়। ভিসা সমস্যায় শামির আটকে যাওয়ায় তরুণীটি ৫ ফেব্রুয়ারি একা ভারতে আসে। তারপর যা ঘটল তা বিশ্বের সামনে ভারতের মাথা নত হয়ে যাওয়ার মতো।

শামিরের পরিবার প্রথমেই এক্যাটরিনাকে ধর্ম পরিবর্তন করার জন্য চাপ দেয়। তরুণীটি অস্বীকার করলে শুরু হয় অত্যাচার। ১৫ ফেব্রুয়ারি অসমে পৌঁছে শামির এক্যাটরিনাকে জানিয়ে দেয় যে, পরিবারের অমতে বিবাহ করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। অতঃপর তরুণীটিকে সে একটি মানসিক হাসপাতালে ভর্তি করে দেয়। সম্পূর্ণ সুস্থ ওই তরুণীর হাত-পা বেঁধে অত্যাচার করা হোত। একটি বেসরকারি সংস্থার ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় এক্যাটরিনা ফেব্রুয়ারির শেষ দিকে হাসপাতাল থেকে মুক্তি পায়। বর্তমানে শামির, তার মা ও বোন এবং মানসিক হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ও এক চিকিৎসকের বিরুদ্ধে পুলিশ মামলা শুরু করেছে। কলকাতার একটি প্রথম সারির দৈনিক পত্রিকায় সংবাদটি প্রকাশিত হয়েছে।

এক্যাটরিনার জীবনে যা ঘটেছে তাকে কেবলমাত্র একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা হিসাবে ধরলে ভুল হবে। মুসলমান আমলে এই ধরনের ঘটনা বহু ঘটেছে। দীনেশচন্দ্র সেন তাঁর 'বৃহৎ বঙ্গ' গ্রন্থের ২য় খণ্ডে (পৃ.-৭৮৭) উল্লেখ করেছেন যে, বাংলার 'বার ভুঁইঞা'র অন্যতম ইশা খাঁ-র পিতা সোলেমান খাঁ পূর্বজীবনে হিন্দু ছিলেন। অযোধ্যার বাইশওয়ার পরগনার ক্ষত্রিয় রাজা ভগীরথের বংশে তাঁর জন্ম হয়। তাঁর পূর্বনাম ছিল কালিদাস। সুলতান জালালউদ্দিনের কন্যা মমিনা খাতুন (মতান্তরে হুসেন শাহের এক কন্যা) সুদর্শন কালিদাসকে স্বেচ্ছায় বিবাহ করতে চেয়েছিলেন। নিষ্ঠাবান হিন্দু কালিদাস একটি পত্রে তাঁকে অনেক সদুপদেশ দেন এবং নম্রভাবে তাঁর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। তখন অপমানিত রাজকুমারী কৌশলক্রমে গোমাংস খাইয়ে তাঁর জাত নষ্ট করেন। কালিদাস তখন অনন্যোপায় হয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন ও রাজকুমারীকে বিবাহ করেন। তৎকালীন মুসলমান পল্লীগীতিকারদের রচনায় এই 'প্রেম'-এর বিবরণ আছে। আজ ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে এই ধরনের ঘটনা প্রতিনিয়ত ঘটে চলেছে। আমার পরিচিত একাধিক পরিবারের তরুণ-তরুণীরা এই অভিনব প্রতারণার শিকার হয়েছে। বিশেষত মেয়েরাই হলো তাদের 'সফট টার্গেট'।

অশিক্ষিত কুসংস্কারাচ্ছন্ন মুসলমান পরিবারগুলির কথা না হয় ছেড়ে দেওয়া যেতে পারে। শহুরে শিক্ষিত মুসলমান তরুণদের মধ্যে উদারতার অভাব লক্ষ্য করেছি কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময়। অধুনা বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত কলকাতার একটি কলেজে গত দশকের প্রথম দিকে একজন মুসলমান ছাত্রের সঙ্গে এক হিন্দু ছাত্রীর প্রেম ছিল। ছেলেটি কলেজের বামপন্থী ছাত্র সংগঠনের নির্বাচিত সদস্য। 'গৈরিক সন্ত্রাস' বিরোধী বহু বক্তৃতা তার মুখে শোনা গেছে কিন্তু মৌলবিদের বিরুদ্ধে একটি শব্দও উচ্চারিত হয়নি। যাই হোক, কয়েক বছরের প্রেমপর্বের পরে ছেলেটি বলে, মেয়েটিকে ধর্ম পরিবর্তন করতে হবে। মেয়েটি অনেক কান্নাকাটি করলেও ছেলেটির মন ভেজেনি। শেষ পর্যন্ত তাদের সম্পর্ক ভেঙে যায়। ছেলেটি বর্তমানে কর্মজীবনে যথেষ্ট প্রতিষ্ঠিত। অনেক বেশি মেধাবী হওয়া সত্ত্বেও প্রেমে আঘাত পেয়ে মানসিক অবসাদের শিকার মেয়েটি তেমন কিছুই করে উঠতে পারেনি। আবার, হায়দরাবাদে আমার পরিচিত আরেকটি পরিবারেও এই ধরনের ঘটনা ঘটেছে।

কোরানের ২.২১ সুরায় মুসলমানদের উপদেশ দেওয়া হয়েছে যে, তাদের পক্ষে কোনো মুশহেক অর্থাৎ ইসলামে অবিশ্বাসী নারীকে বিবাহ করা উচিত নয় যতক্ষণ না তারা ঈমান গ্রহণ করে। মুশহেক নারী অপেক্ষা মুসলমান ক্রীতদাসীও ভাল। ইসলাম সম্পর্কিত ওয়েবসাইটগুলি স্পষ্টই জানিয়েছে যে, মুসলমান তরুণরা খৃষ্টান বা ইহুদি রমণীকে বিবাহ করতেই পারে। কিন্তু পৌত্তলিক অর্থাৎ মূর্তিপূজায় বিশ্বাসী কোনো রমণীকে তারা বিবাহ করতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তারা ইসলাম গ্রহণ না করছে। দুই প্রাক্তন ভারতীয় ক্রিকেটারের কথা আমরা জানি যাঁদের হিন্দু প্রেমিকারা বিবাহের পূর্বে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। তাঁদের একজনের পুত্রবধূ রুপালি পর্দার জনপ্রিয় এক নায়িকা। তিনিও জন্মসূত্রে হিন্দু এবং পোশাক-আশাকে অত্যাধুনিকা। কিন্তু বিবাহের পরে বোরখা পরিহিত তাঁর একটি ছবি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হলে বিতর্কের ঝড় উঠেছিল। নায়িকার এই বিবর্তন কীভাবে হলো তা নিশ্চয়ই বলে দিতে হবে না। পরিশেষে, এক 'হার্টথ্রব' অভিনেতার কথা তিনি প্রকাশ্যে জানাচ্ছেন যে, তবে তাঁর সন্তানরা কিন্তু 'কেবলমাত্র মুসলমান' হবে। সে তো অবশ্যই। কারণ, তাঁর সাম্প্রতিকতম ছবিতে তো তিনি হিন্দু ধর্মান্ধ ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজকে দশ গোল দিয়েছেন! সত্যমেব জয়তে। ■

যোগ চিকিৎসা

যে কোনও শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৮১০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনষ্টিটিউট অব কালচার,
যৌগিক কলেজ অ্যাণ্ড নার্সিং হোম,

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯ ফোন : ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩ যৌগিক নার্সিংহোম (২০টা শয্যা) : ২নং ঘোষপাড়া, নাজিরবাগান, ঢাকুরিয়া, কলকাতা-৭০০ ০৭৮ ফোন : ২৪১৫-৩৫৬৬

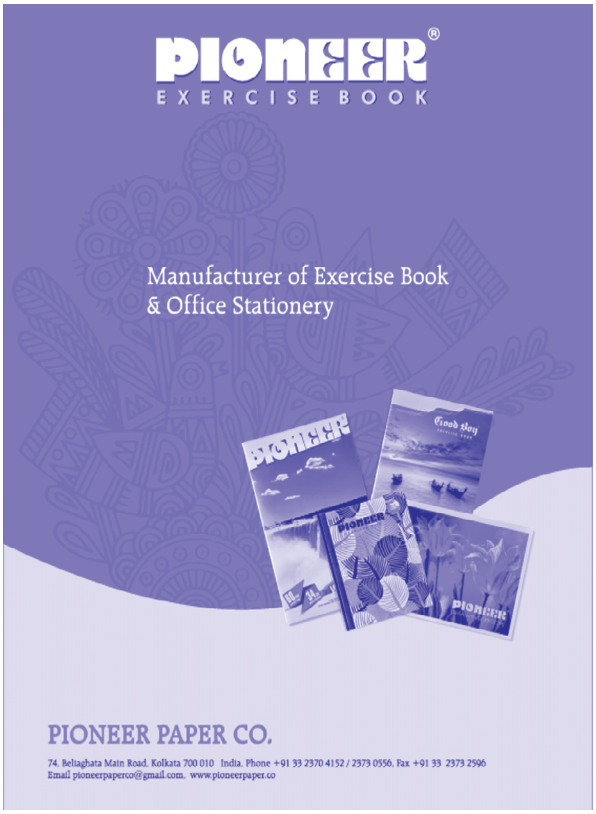

"একথা স্পষ্ট, ভারতীয় নারীর প্রাচীন শিক্ষাপদ্ধতির মূল লক্ষ্য ছিল চরিত্রগঠন। নূতন শিক্ষাপদ্ধতির লক্ষ্যও নিম্নতর হতে পারে না।
ভারতে মেয়েদের শিক্ষাপদ্ধতি এমন হওয়া উচিত যাতে তারা যথার্থ ভারতীয় নারী হতে পারে।
ভারতের আদর্শগুলি কি এবং কিভাবে তা লাভ করা যায়— শিক্ষার মাধ্যমে তাদের নিজেদেরই এসব হৃদয়ঙ্গম করতে হবে।"

— ভগিনী নিবেদিতা

সৌজন্যে : ভগিনী নিবেদিতা সেবা ভারতী

গান্ধীর চিন্তা বিষয়ে প্রথামিক জ্ঞান অর্জন করতে পারবেন

কল্যাণ ভঞ্জচৌধুরী

ড. দেবব্রত চৌধুরী ও ড. সত্যরঞ্জন ধর লিখিত 'রেলিভ্যান্স অফ গান্ধিয়ান থটস টুডে' গ্রন্থটি গান্ধী সাহিত্যে একটি নতুন সংযোজন। ১২৪ পৃষ্ঠার এই গ্রন্থটিতে লেখকদ্বয় সবিস্তারে দেখিয়েছেন আজকের দিনে মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর প্রাসঙ্গিকতা। গ্রন্থটি মোট ৮টি অধ্যায়ে বিভক্ত। গান্ধীর দৃষ্টিতে অর্থনীতি, শ্রমনীতি, প্রযুক্তি, ধর্মঘট, গ্রামীণ শিল্পায়ন, গ্রামোন্নয়ন, গ্রাম পরিকল্পনা, রুটি ও স্বাধীনতা— এই কটি বিষয় একেক অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। লেখকদ্বয় গান্ধীর রচনা বিশেষ করে হরিজন থেকে উদ্ধৃতি সহযোগে অতি সহজ ও সাবলীল ভাষায় গান্ধীর চিন্তাধারা ব্যক্ত করেছেন। মোট কথা, এই গ্রন্থটি পড়লে যে কোনো ব্যক্তি গান্ধীর চিন্তা বিষয়ে প্রাথমিক জ্ঞান অর্জন করতে পারবেন।

কিন্তু দুঃখের বিষয়, ড. চৌধুরী ও ড. ধর তাঁদের গ্রন্থে গান্ধীর চিন্তাধারার সম্যক বিশ্লেষণ করেননি। গান্ধীর অর্থনীতি, শ্রমিক সমস্যা, অহিংসা ইত্যাদি বিষয়ে তাঁর জীবিতকালে এবং পরে অন্তহীন সমালোচনা হয়েছে এবং এখনো হচ্ছে। অনেকে তাঁর চিন্তাধারাকে অবাস্তব বলে ধূলিসাৎ করেছেন। এই সমস্ত বিরূপ সমালোচনা এবং তার উত্তর এই পণ্ডিত লেখকদের কাছে প্রার্থিত ছিল। কিন্তু তা না করাতে গ্রন্থটি আকর্ষণ হারিয়েছে। গান্ধী তাঁর হিন্দ স্বরাজ গ্রন্থে ট্রেন, হাসপাতাল, ডাক্তার, পার্লামেন্ট ইত্যাদিকে অপ্রয়োজনীয় বলে ঘোষণা করেছিলেন। এগুলি বাদ দিয়ে কীভাবে আধুনিক ও সুস্থ সমাজ তৈরি হতে পারে? গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের অস্তিত্ব পার্লামেন্ট ছাড়া অসম্ভব। অথচ গান্ধী পার্লামেন্টকে নস্যাত করে দিয়েছেন হিন্দ স্বরাজ গ্রন্থে এবং তাঁর কর্মজীবনে। ১৯২০ ও তার পরবর্তীতে সাধারণ নির্বাচন এবং সরকার গঠনের ব্যাপারে তিনি নিস্পৃহ ও উদাসীন ছিলেন। অথচ সরকার ছাড়া গণতন্ত্র অসম্ভব। তাহলে গান্ধীর প্রাসঙ্গিকতা কোথায়?

সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে শিল্পের বিকাশ অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু গান্ধীজী যন্ত্র তথা শিল্পকে কোনো গুরুত্ব দেননি। সুভাষচন্দ্র বসু প্ল্যানিং কমিশন গঠন করলে তিনি প্রবল আপত্তি করেছিলেন। গান্ধী ভারি শিল্পের কোনো প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেননি। এ বিষয়ে লেখকদ্বয়ের বক্তব্য পরিষ্কার হওয়ার দরকার ছিল। লেখকেরা গ্রন্থের শুরুতে গুনার

মিরডালের উল্লেখ করেছেন। তাঁর বক্তব্য, গান্ধীর মূল নীতি থেকে বিচ্যুত হওয়ার কারণে ভারতের অগ্রগতি শ্লথ হয়েছে। গান্ধীর মূল নীতি ধরে থাকলে পারমাণবিক কেন্দ্র, বাঁধ, উপগ্রহে যান পাঠানো, ইত্যাদি কী সম্ভব হত? যদি গ্রামের মধ্যে মানুষকে আবদ্ধ রাখা হোত তাহলে মানুষের মনীষার বিকাশ যা বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কারের মধ্যে রূপ পেয়েছে তা কি সম্ভব হত?

গান্ধী চরকার উপরে জোর দিয়েছেন। বলতে গেলে চরকা তাঁর দর্শনে বড় স্থান গ্রহণ করেছে। এ নিয়ে তাঁর সঙ্গে সুভাষচন্দ্র বসু, চিত্তরঞ্জন দাস, মানবেন্দ্র রায় প্রমুখ নেতার প্রবল তর্ক হয়েছিল। তাঁরা চরকার প্রাসঙ্গিকতা মানতে চাননি। ড. চৌধুরী ও ড. ধর এবিষয়ে আলোচনা করে গান্ধীর চরকা বিষয়ে প্রাসঙ্গিকতা আছে কিনা আমাদের জানাতে পারতেন।

গান্ধী তার 'লেটারস টু এ ব্রিটন' শীর্ষক চিঠিতে ইংরেজদের হিটলারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করার পরামর্শ দিয়েছিলেন। হিটলারের হাতে ইংরেজদের মৃত্যুর পর এক মহান ইংরেজ জাতির সৃষ্টি হবে। গান্ধীর এই বক্তব্যকে ইংরেজরা পাগলের প্রলাপ বলে উড়িয়ে দিয়েছিলেন। মুসলিম লিগ গুণ্ডাদের হাতে আক্রান্ত পাঞ্জাব, সিন্ধু, নোয়াখালির হিন্দুদের গান্ধী একই রকম উপদেশ দিয়েছিলেন, অর্থাৎ মুসলিম লিগ গুণ্ডাদের বাধা না দিয়ে মৃত্যুবরণ করতে হবে। লেখকদ্বয় কীভাবে এবিষয়ে গান্ধীর অহিংসা তত্ত্বকে দেখবেন? গান্ধী অহিংসার আদর্শে অবিচল থেকে প্রয়োজনে আত্মহননের উপর জোর দিয়েছেন। কিন্তু আত্মরক্ষা যে মানুষের সহজাত ধর্ম— গান্ধী অহিংসার আদর্শ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে এই সত্যটি ভুলে গিয়েছিলেন। যত বড় গান্ধী-প্রেমিক হন না কেন কেউ এই উপদেশ মেনে নেবেন না। শুধু তাই নয়, গান্ধী দরকার হলে দেশকে বিদেশির হাতে সমর্পণ করতে বলেছিলেন।

বলা বাহুল্য এই মানসিকতা থাকার জন্য তিনি পাকিস্তান আন্দোলনের বিরোধিতা করেননি। পাকিস্তান মেনে নিয়েছিলেন, উপরন্তু সারা ভারত পাকিস্তান হলেও তার আপত্তি নেই বলেছিলেন। এমন বিপজ্জনক চিন্তা অর্থাৎ দেশ জাহান্নামে যাক, মানুষ আত্মহনন করুক এই যাঁর উপদেশ তাঁর প্রাসঙ্গিকতা কোথায়?

মোট কথা, ড. দেবব্রত চৌধুরী ও ড. সত্যরঞ্জন ধর লিখিত 'রেলিভ্যান্স অফ গান্ধিয়ান থটস টুডে' গ্রন্থটি পড়ে চিন্তাশীল পাঠকের মনে হবে তাঁরা অন্ধভাবে গান্ধীর অর্থনীতি, সমাজনীতি প্রভৃতি বিষয়ে মতগুলি গ্রহণ করেছেন। গ্রন্থের প্রারম্ভে লেখকদ্বয় জানিয়েছেন তাঁরা ম্যানেজমেন্টের উচ্চ ডিগ্রিধারী। কিন্তু ম্যানেজমেন্ট তো আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলে, প্রশ্ন করতে শেখায়, অন্ধভাবে কোনো মত বা ব্যক্তিকে গ্রহণ করার বিরুদ্ধে। ওঁদের গ্রন্থ পড়ে এই কথাটি বারে বারে মনে জাগে।

ড. দেবব্রত চৌধুরী ও ড. সত্যরঞ্জন ধর— 'রেলিভ্যান্স অফ গান্ধিয়ান থটস টুডে'। মিশন **পাব্লিসার্স। সোদপুর। মূল্য : ১৫০ টাকা।**

বিজেপি রাজ্য মানবাধিকার সেলের পক্ষ থেকে সারা রাজ্য পুলিশ আধিকারিককে স্মারকলিপি প্রদান

সারা রাজ্যে তৃণমূল সরকার যেভাবে সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েমের দিকে ধাপে ধাপে এগিয়ে যাচ্ছে তার একটা প্রধান হাতিয়ার হয়ে উঠেছে রাজ্যের পুলিশ প্রশাসন। সংবিধানের সকল স্তম্ভকে ধূলিসাৎ করে ফেলেছে। সরকারি দলের নেতা কর্মীরা আজ পুলিশের গায়ে হাত তুলেছে। থানা ভাঙচুর করছে, ট্রাফিক কনস্টেবলকে অগ্রাহ্য করছে, চড় মারছে তাদের সাংসদ। এফ আই আর হওয়া সত্ত্বেও তৃণমূলের নেতারা অধরা। অথচ বিজেপি ও অন্যান্য বিরোধীদের নেতা কর্মীদের

প্রতিবাদ অভিযানে সাধারণ সম্পাদক দিলীপ ঘোষ ও অন্যান্যরা।

মিথ্যা মামলা দিয়ে জেলে ঢোকানো হচ্ছে। তাদের বাড়িতে গিয়ে হামলা হচ্ছে। মারধর করা হচ্ছে। গুলি চলছে। কিন্তু পুলিশ নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করছে। এর বিরুদ্ধে বিজেপি রাজ্য মানবাধিকার সেলের উদ্যোগে গত ২৮-২৯ মে রাজ্যজুড়ে জেলা তথা উত্তরবঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গের পুলিশ আধিকারিকের অফিসে বিক্ষোভ সমাবেশ ও স্মারকলিপি প্রদানের মাধ্যমে প্রতিবাদ জানানো হয়। রাজ্য সভাপতির অনুমতিক্রমে এই প্রতিবাদ কর্মসূচি সাফল্যের সঙ্গে পালিত হয়। বিশেষ করে উত্তরবঙ্গে সেলের রাজ্য কো-কনভেনর অমিতাভ মৈত্রের উদ্যোগে এই কমকাণ্ড পালিত হয়। বর্ধমানেও এই কর্মসূচি পালিত হয়। উল্লেখ্য এই প্রতিবাদের প্রধান দাবি ছিল রাজ্যে পুলিশ প্রশাসনকে নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে হবে। বিজেপি-র ও বিরোধীদলের সমস্ত মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার করে যারা জেলে আছে তাদের মুক্তি দিতে হবে। রাজ্যে নারীনির্যাতন ও সন্ত্রাস বন্ধ করতে হবে। রাজ্য মানবাধিকার কমিশনে উপযুক্ত স্থায়ী চেয়ার‌্যান নিযুক্ত করতে হবে।

দিলীপ ঘোষ (সাধারণ সম্পাদক রাজ্য), রাজু ব্যানার্জী, সায়ন্তন বসু প্রমুখ বিভিন্ন জেলায় এই প্রতিবাদ অভিযানে অংশগ্রহণ করেন।

সমাবেশ সমাচার

মঙ্গলনিধি

দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বদলপুর গ্রামের কৃষক অশ্বিনী কুমার রায় তাঁর দ্বিতীয় পুত্র ক্ষেত্রমোহন রায়ের শুভ বিবাহ উপলক্ষে গত ১১ মে ভারতীয় কিষাণ সঙ্ঘের জেলা সম্পাদক অধীর কুমার দাসের হাতে 'মঙ্গলনিধি' অর্পণ করেন। অনুষ্ঠানে বিশেষভাবে উপস্থিত ছিলেন কিষাণ সঙ্ঘের কার্যকর্তা মহেন বর্মণ ও অন্য কার্যকর্তারা।

শোকসংবাদ

তারকেশ্বর পালের জীবনাবসান

ভারতীয় ইতিহাস সঙ্কলন সমিতির সহ-সভাপতি এবং বিভিন্ন আইন সংগঠনের প্রবীণ সদস্য তারকেশ্বর পাল গত ২৭ মে পিয়ারলেস হসপিটালে সামান্য রোগভোগের পর পরলোকগমন করেন। তিনি পেটের পীড়ায় ভুগছিলেন। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের তৃতীয়বর্ষ শিক্ষিত তারকেশ্বরবাবুর ১৯৪৭ সনে ঢাকা শহরে জন্ম। পরবর্তীকালে তিনি আইন ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত হয়ে কলকাতা হাইকোর্ট এবং আলিপুর কোর্টে সিনিয়র অ্যাডভোকেট হিসাবে পরিগণিত হন। কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা গঠিত নেতাজী অন্তর্ধান বিষয়ক জাস্টিস মনোজ মুখার্জি কমিশনে তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন। তিনি বহু সমাজসেবামূলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আজীবন যুক্ত ছিলেন। তাঁর বেশ কিছু লেখা স্বস্তিকায় প্রকাশিত হয়েছে। তিনি রেখে গেছেন স্ত্রী দুর্গা ঘোষ ও বহু গুণমুগ্ধ বন্ধুকে। ভগবানের কাছে তাঁর আত্মার শান্তি প্রার্থনা করি।

***

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রবীণ প্রচারক রাধাগোবিন্দ পোদ্দারের ছোটবোন লক্ষ্মী কুণ্ডু গত ২১ মে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৫ বছর।

অতীত ও বর্তমানের আলোকে ঐতিহ্যের মোহনবাগান

দীর্ঘ তেরো বছর পর আই লিগ জয়ের উচ্ছ্বাসে মোহনবাগান।

কৃষ্ণেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

একটি জনপ্রিয় নামি সংবাদপত্রের পাতায় এক বিজ্ঞাপন নজরে এল, যা অনেকটা নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নির্বাচনী প্রচারের অনুরূপ। বিজ্ঞাপনটি এই প্রকার : 'স্বচ্ছ মোহনবাগান গড়তে, দুর্নীতিমুক্ত ক্লাব প্রশাসন গড়তে, বিভিন্ন আর্থিক কেলেঙ্কারিতে জড়িত প্রার্থীদের পরাজিত করতে, ক্লাবে খেলা রক্ত ও ঘাম ঝরানো ক্রীড়াবিদদের প্রকৃত সম্মান দিতে, ক্লাবের আর্থিক দুর্নীতির তদন্তের দাবীতে, ঐতিহ্যবাহী ক্লাবকে ব্যক্তিগত সম্পত্তি করা আটকাতে, ক্লাবের সুস্থ পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে, ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করুন।'

বিজ্ঞাপনটি পড়তে পড়তে ভাবছিলাম এই কি সেই মোহনবাগান ক্লাব যা বর্তমানে ভারতবর্ষের 'জাতীয় ক্লাব'-এর সম্মানে ভূষিত? এই কি সেই মোহনবাগন ক্লাব যারা ১৯১১ সালে ২৯ জুলাই বৃটিশ ক্লাব ইস্ট ইয়র্কশায়ার রেজিমেন্টকে হারিয়ে সারা ভারতবর্ষব্যাপী প্রবল আলোড়ন তুলেছিল? শুধু তাই নয়, এই ঘটনা ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনে প্রভাব ফেলতেও সমর্থ হয়েছিল। খালি পায়ে বাঙালি ফুটবলাররা বুটপরিহিত শক্তসমর্থ চেহারার বৃটিশদের বিরুদ্ধে যে অসম লড়াই করে জয়ী হয়েছিল তৎকালীন প্রথিতযশা কবি করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় তাতে উজ্জীবিত হয়ে লিখেছিলেন—

'জেগেছে আজ দেশের ছেলে, পথে লোকের ভীড়,
অন্তঃপুরে ফুটলো হাসি বঙ্গ-রূপসীর।
গোল দিয়েছে গোরার গোলে বাঙালীর আজ জিত,
আকাশ ছেয়ে উঠছে উধাও উন্মাদনার গীত।
আজকের এই বিজয়বাণী ভুলবে নাকো দেশ,
সাবাস! সাবাস! মোহনবাগান খেলেছ ভাই বেশ।'

১৮৮৯ সালে ১৫ আগস্ট তৎকালীন বিশিষ্ট আইনজীবী ভূপেন বসুর বাড়িতে এই ক্লাবের প্রতিষ্ঠা হয়। সেই সময় উত্তর কলকাতা অঞ্চল আভিজাত্য, বনেদিয়ানা এবং বাঙালিয়ানায় সমাজে এক বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। সমাজের বিশিষ্ট এবং প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিগণের বসবাস এই উত্তর কলকাতা অঞ্চলে। এইরকম এক পরিবেশের মধ্যে উদ্ভব মোহনবাগান ক্লাবের। তাই প্রাক্-স্বাধীনতা যুগে বাঙালির কাছে মোহনবাগান ছিল জাতীয়তাবোধ এবং সেইসঙ্গে বিশুদ্ধ বাঙালিয়ানার প্রতীকস্বরূপ। শুধু বাংলাই নয়, বাংলার বাইরেও মোহনবাগানের জনপ্রিয়তা প্রসার লাভ করেছিল। ভারতবর্ষের প্রথম রাষ্ট্রপতি বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ মোহনবাগান ক্লাবের বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। প্রাক্তন প্রতিরক্ষামন্ত্রী এবং বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ জগজীবনরামের মোহনবাগান ক্লাবের প্রতি আন্তরিক ভালবাসা ছিল।

কল্লোল যুগের অন্যতম সাহিত্যিক এবং বিশিষ্ট জীবনীকার অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তর লেখা কল্লোলযুগ গ্রন্থ থেকে জানা যায়, তৎকালীন জনপ্রিয় সাহিত্যিকগণ যথা কাজী নজরুল ইসলাম, শিবরাম চক্রবর্তী প্রমুখ নিয়মিত মোহনবাগান মাঠের দর্শকাসনে হাজির থাকতেন। মাঠে খেলা চলছে আর অন্যদিকে হাসির রাজা শিবরাম চক্রবর্তী যিনি শিব্রাম চক্রবর্তী নামেও পরিচিত ছিলেন, তাঁর মুখে চলছে শব্দের খেলা। গোষ্ঠ পালকে বলছেন 'গোস্ত', আবার উমাপতি কুমার ফাউল করলে বলে উঠতেন কু-মার। এমনই মজার ছিল মাঠের পরিবেশ। বাংলার বিখ্যাত সঙ্গীত শিল্পী ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য মোহনবাগান মাঠে নিয়মিত খেলা দেখতে আসতেন। তিনি ছিলেন চুনী গোস্বামীর অনুরাগী।

আধুনিক বাংলা ও হিন্দীগানের জনপ্রিয় শিল্পী মান্না দে মুম্বই থাকাকালীন রোভার্স কাপ প্রতিযোগিতায় মোহনবাগানের খেলা থাকলে মাঠে হাজির হতেন। এক দূরদর্শন সাক্ষাৎকারে মান্নাবাবু জানিয়েছিলেন যে তিনি এবং অপর এক নামি সঙ্গীত শিল্পী শচীনদেব বর্মন মুম্বইয়ের মাঠে মোহনবাগান বনাম ইস্টবেঙ্গল ম্যাচ দেখতে গিয়েছেন। শচীনদেব বর্মন ছিলেন কট্টর ইস্টবেঙ্গল সমর্থক আর অন্যদিকে মান্না দে তো মোহনবাগান সমর্থক। দুজনে পাশাপাশি বসেছেন খেলা দেখতে সঙ্গে এক ঠোঙা বাদাম। প্রথমে মোহনবাগান

With Best Complements From

AN ISO-9001
CERTIFIED
COMPANY

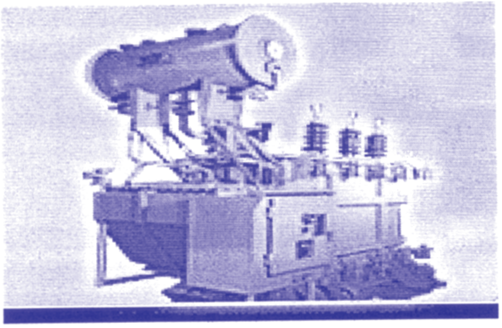

EIU

EIU

East India Udyog Limited

145, G.T. ROAD, SAHIBABAD
GHAZIABAD - 210 005 (UP)

Phone : [0120] 4105890
e-mail : eiulgbd@vsnl.com
eiulgbd@rediffmail.com
URL : www.eastindiaudyog.com

Manufacturers of :
"ETS" MAKE POWER & DISTRIBUTION
TRANSFORMERS UPTO 15 MVA & 33 KV CLASS

এক গোল দিল। মান্না দে খুশিতে ডগমগ কিন্তু পাশেই ব্যাজারমুখে বসে আছেন শচীনকর্তা। মোহনবাগান যখন দ্বিতীয়বার গোল করলো শচীনদেব বর্মন তখন দাঁড়িয়ে উঠে বললেন, 'নাঃ আর খেলা দেখা যায় না। চল মনা বাড়ি যাই।' মান্না দে অগত্যা ম্লান মুখে নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও শচীনদেব বর্মনের পিছু পিছু মাঠ ছাড়লেন।

বাংলা চলচ্চিত্রের বিশিষ্ট অভিনেতা জহর গাঙ্গুলী, যিনি ভক্তমহলে সুলালদা নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি তাঁর ব্যস্ত অভিনয় জীবনের ফাঁকে সময় পেলেই মোহনবাগান মাঠে খেলা দেখতে হাজির হতেন। ১৯৩৯ সালে মোহনবাগান ক্লাব যখন প্রথম কলকাতা ফুটবল লিগ জয় করে তিনি তৎকালীন অধিনায়ক এবং লিগজয়ী দলের সদস্য বিমল মুখার্জিকে নিয়ে আনন্দে উদ্দাম নৃত্য করেছিলেন। প্রবীণ মানুষদের স্মৃতিচারণা থেকে একথা জানা যায়।

এইসব বিবরণ থেকে আরও জানা যায় মোহনবাগান মাঠে তৎকালীন সমাজের সেরা নক্ষত্রগণের আবির্ভাব ঘটত। আর 'মোহনবাগান ক্লাব' বলতেই সাধারণ মানুষজনের মানসপটে ভেসে উঠত অভিজাত, শৃঙ্খলাবদ্ধ অতিজনপ্রিয় এক ক্লাবের কথা। শৃঙ্খলাপরায়ণতা ছিল এই প্রতিষ্ঠানের এক অন্যতম বৈশিষ্ট্য। গোষ্ঠ পালের মতো প্রবাদপ্রতিম ফুটবল খেলোয়াড় রেফারির কোনো এক সিদ্ধান্তে অখুশি হয়ে সজোরে ফুটবলে লাথি মেরে উষ্মা প্রকাশ করেছিলেন। এই আচরণের জন্য তাঁকে ক্লাব কর্তৃক শাস্তির মুখে পড়তে হয়।

অনেক ফুটবলার তাঁদের সমগ্র ফুটবল-জীবন এই ক্লাবেই অতিবাহিত করেন। অন্য ক্লাবের আহ্বান তাঁরা অনায়াসেই অগ্রাহ্য করেছিলেন। এমনই ছিল ক্লাবের প্রতি তাঁদের দায়বদ্ধতা এবং আত্মনিবেদন। বিশিষ্ট নক্ষত্র ফুটবলারগণ এই ক্লাবকে যেন আলোকিত করে রাখতেন। তাঁদের নাম শুনলেই মনে সম্ভ্রম জাগে— যথা, শিবদাস ভাদুড়ী, বিজয়দাস ভাদুড়ী, গোষ্ঠ পাল, বলাইদাস চ্যাটার্জি, উমাপতি কুমার, শৈলেন মান্না, চুনী গোস্বামী। এছাড়া আরও অজস্র ফুটবলার আছেন যাঁদের ক্লাবের প্রতি অবদান কোনো অংশে কম নয়।

এছাড়াও ধীরেন দেবের মতো ঐতিহাসিক আই এফ এ শীল্ডজয়ী দলের অন্যতম সদস্য। তিনি উত্তরপাড়া অঞ্চলে আমাদের বাড়ির কাছেই বসবাস করতেন। তাঁর সুযোগ্য পুত্র মোহনবাগান দলের প্রথম কলকাতা ফুটবল লিগ জয়ী (১৯৩৯) দলের অধিনায়ক ছিলেন। আমার বাবা-মা'র সঙ্গে এই দুজনের বিশেষ পরিচয় ছিল এবং আমাদের বাড়িতে তাঁদের যাতায়াত ছিল। একটা ঘটনার কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে চাই যেটা মনমোহন মুখার্জি মহাশয় আমার বাবাকে বলেছিলেন। ১৯১১ সালের আই এফ এ শীল্ড ফাইনালে প্রথমার্ধে মোহনবাগান এক গোলে পিছিয়ে ছিল। অভিলাষ ঘোষ ওই দলেরই এক সদস্য ছিলেন এবং জয়সূচক গোল তাঁর পা থেকেই এসেছিল। দ্বিতীয়ার্ধে দল মাঠে নামার সময় অভিলাষবাবু তাঁর পূর্ববঙ্গীয় টানে মোহনবাগান ক্লাবের এক কর্মকর্তাকে বলেন, রইল মশায় আমার স্ত্রী সন্তান, তাদের দেখবেন। যদি জিতে ফিরে আসতে না পারি তাহলে মাঠেই মৃত্যুবরণ করব।'

কী অসাধারণ দুর্জয় মনোভাবাপন্ন এবং নিবেদিতপ্রাণ ফুটবলার ছিলেন তিনি, বর্তমান প্রেক্ষিতে তা ভাবলে অবাক লাগে। আমার মা এই বৃদ্ধা বয়সেও একথা স্মরণ করে বিশেষ গর্ব অনুভব করেন যে মনমোহন মুখার্জির মতো এক যথার্থ দেশপ্রেমিক ফুটবল খেলোয়াড়ের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল।

এশিয়ার অন্যতম প্রাচীন ক্লাব এবং ভারতবর্ষের জাতীয় ক্লাব মোহনবাগানকে নিয়ে লেখা হয়েছে একাধিক গ্রন্থ। লেখা হয়েছে কবিতা, গান, এই ক্লাবকে বিষয়বস্তু করে নির্মিত হয়েছে তথ্যচিত্র এবং বাণিজ্যিক চলচ্চিত্র। ভারতবর্ষের আর কোনো ক্লাবের এমন সৌভাগ্য লাভ করবার সুযোগ হয়েছে বলে জানা নেই। কিছুদিন আগে একটি ইংরাজি সংবাদপত্রে অতীতের গৌরবোজ্জ্বল, কিন্তু বর্তমানে ভগ্নদশাপ্রাপ্ত একটি প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে বলতে গিয়ে লেখা হয়েছে--- Past Perfect, present tense। বর্তমানের মোহনবাগান ক্লাব সম্বন্ধে বলতে গেলে ওই একই বাক্যের প্রয়োগ করতে হয়। এটা ভাবলে খুবই দুঃখ লাগে যে অতীতের ঐতিহ্য, বনেদিয়ানা এবং বাঙালিয়ানা হারিয়ে বাংলার গৌরব এই ক্লাব 'ভগ্ননীড়'-এ পরিণত হয়েছে।

অতীতের অনেক ফুটবলারই এই ক্লাব সম্বন্ধে আর বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেন না। অনেক সাধারণ মানুষ যারা কোনো রাজনীতির মধ্যে থাকে না, শুধুমাত্র ভালবাসার টানে এই ক্লাবের প্রাঙ্গণে নিয়মিত হাজির হন, আজ সেইসব মানুষের সংখ্যাও উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে। একদম নতুন প্রজন্মেরও মধ্যেও এই ক্লাবের প্রতি আগ্রহের অভাব পরিলক্ষিত হয়। ভাবতে অবাক লাগে এই ১২৫ বছরের ঐতিহ্যময় প্রতিষ্ঠানের সদস্যসংখ্যা মাত্র নয় হাজারের কিছু বেশি!

আমি বেশ কিছু বছর আগে মোহনবাগানের খেলা দেখতে দর্শকাসনে উপস্থিত হয়েছিলাম। খেলা চলাকালীন একশ্রেণীর দর্শকের মুখে যেরূপ অশালীন, অশ্রাব্য এবং অশ্লীল শব্দের বল্গাহীন প্রয়োগ দেখলাম, তাতে ওইস্থানে পুনরায় যাবার আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছি। বুঝতে পারলাম পরিবেশ বদলে গেছে। আমার মতো এই অভিজ্ঞতা হয়ত অনেকেরই আছে। বিভিন্ন মহলে শোনা যায় কতিপয় অসাধু শ্রেণীর কর্মকর্তা মোহনবাগান ক্লাবকে কুক্ষিগত করে রেখেছে। ক্লাবের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব, গোষ্ঠীকোন্দল এবং পরস্পরের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার সংবাদপত্রের পাতায় বহুল আলোচনার বিষয়। ফৌজদারি মামলার কারাদণ্ড প্রাপ্ত আসামিও মোহনবাগান ক্লাবের কার্যকর্তার পদ আলোকিত করে রাখছে। এছাড়াও, দেখা যাচ্ছে যে একটি বিশেষ রাজনৈতিক দল এই ক্লাবকে তাদের আখড়ায় পরিণত করতে বদ্ধপরিকর। এইসব বিষয় জনমানসে এই ঐতিহ্যবাহী ক্লাবের ভাবমূর্তি মলিন করে দিচ্ছে।

অন্যদিকে, যে জন্য ক্লাবের এই খ্যাতি এবং জনপ্রিয়তা সেই ফুটবল খেলায় ক্লাবের দক্ষতা সেইভাবে প্রকাশিত হচ্ছে না। উক্ত বিষয়টি ক্রমশ যেন পিছনের সারিতে চলে যাচ্ছে। প্রতিভাবান বাঙালি ফুটবলার নেই বললেই চলে, শুধুমাত্র কিছু মাঝারি ও নিম্নমানের ভিনদেশি এবং ভিন রাজ্যের ফুটবলার ক্লাব ময়দানে জাঁকিয়ে বসেছে। দীর্ঘ তেরো বছর পর আই লিগে জয়ের মুখ দেখল মোহনবাগান। একদা অন্যরাজ্যের প্রতিভাবান ফুটবলাররা মোহনবাগানে সুযোগ লাভ করবার জন্য উদগ্রীব হয়ে অপেক্ষা করতেন। পাঞ্জাব প্রদেশ থেকে আগত ভারতবর্ষের অন্যতম সেরা আন্তর্জাতিক ফুটবলার জার্নাল সিং এই ক্লাব তাঁবুকে গুরুদ্বারের মতো পবিত্র জ্ঞান করতেন। আজ সেসব ঘটনা অতীতের দীর্ঘশ্বাস মাত্র। ■

শব্দরূপ-৭৫০ শামাপ্রসাদ দাশ

১			২	■	৩		৪
	■	■	৫	৬	■	■	
	■	■	৭		■	■	
৮	৯	১০	■	১১	১২	১৩	■
■	১৪		১৫	■	১৬		১৭
১৮	■	■	১৯	২০	■	■	
	■	■	২১		■	■	
২২			■	২৩			

সূত্র :

পাশাপাশি : ১. রামগিরি পর্বত, **৩.** আয়না, **৫.** দ্বিত্বে খাবার গেলার ঢং, **৭.** '—জাগা দু'টি চোখ' (মান্না দে), **৮.** পাগড়ির চূড়া, **১১.** তাঁতের যন্ত্রাংশ, **১৪.** '...তীর্থে—বঙ্গে', **১৬.** জেলে, **১৯.** নায্য, **২১.** জুতোর ফরমা, **২২.** '—কহিল উচ্চে স্বর্ণলতিকারে', **২৩.** '—যায় বয়ে যায়...' (তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়)।

উপর-নীচ : ১. '—করে বালি কোথা নাহি কাদা', **২.** চতুর ও চটপটে, **৪.** ঘাগরা; 'ঝরো ঝরো ধারে ভিজিবে---', **৬.** পাখির ডানা, **৯.** 'যেদিন—বিদায়', **১০.** সিংহের জন্য সংরক্ষিত স্থান, **১২.** পঞ্চ—, **১৩.** 'পাখি সব করে—' **১৫.** দশ ফোঁটার তাস, **১৭.** রাজা রাবণ, **১৮.** বিষ্ণু, **২০.** দিব্যি, কিরা।

সমাধান
শব্দরূপ-৭৪৭
সঠিক উত্তরদাতা
শৌনক রায়চৌধুরী
কলকাতা-৯
সুশীল কয়াল
কলকাতা-৬

ম	■	জ	লু	স	■	ঋ	■
ক	■	ঠি	■	গ	বা	ক্ষ	■
র	ঙ্গি	লা	■	র	■	রা	■
ধ্ব	■	■	■	■	নি	জা	ম
জ	বা	লা	■	■	■	■	ৎ
■	ল	■	বা	■	ব	য়	স্য
■	খি	ল	ক	■	শ্য	■	গ
■	ল্য	■	ল	লি	তা	■	ন্ধা

শব্দরূপের উত্তর পাঠান আমাদের ঠিকানায়।
খামের ওপর লিখুন 'শব্দরূপ'।

- ৭৫০ সংখ্যার সমাধান আগামী ২২ জুন ২০১৫ সংখ্যায়

লেখক-লেখিকাদের প্রতি

- ভারতীয় সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের প্রতি অনুকূল লেখাই প্রকাশ করা হয়।
- যে কোনো রকম লেখা, তা চিঠিপত্র, সংবাদ বা আলোচনা যাই পাঠান না কেন, কাগজের একপিঠে পরিষ্কার হাতের লেখায় দু'দিকে যথেষ্ট মার্জিন বা ফাঁক রেখে পাঠাতে হবে। অথবা টাইপ করে বা সিডি-তে পাঠালে ভালো হয়। কোনো লেখারই ফটোকপি গ্রাহ্য হবে না। লেখক বা লেখিকার নাম, পুরো ঠিকানা, ফোন নম্বর থাকা অবশ্যই দরকার এবং সংক্ষিপ্ত পরিচিতি থাকা বাঞ্ছনীয়। অমনোনীত লেখা ফেরত দেওয়া সম্ভব নয়।
- চিঠিপত্র বিভাগে লেখা পাঠালে খামের উপর 'চিঠিপত্র' কথাটি অবশ্যই লিখবেন। 'চিঠিপত্র' **১৫০টি** শব্দের মধ্যে হতে হবে। একই কথা প্রযোজ্য শব্দছকের ক্ষেত্রে। খামের উপর 'শব্দরূপ' লিখতে হবে।
- ভ্রমণ বিষয়ক লেখার সঙ্গে প্রাসঙ্গিক ছবি (ফটো প্রিন্ট) পাঠানো বাঞ্ছনীয়। অন্যান্য ধরনের লেখার ক্ষেত্রেও প্রাসঙ্গিকতা বিবেচনায় ছবি পাঠানো যেতে পারে।
- পূর্বে প্রকাশিত কোনো লেখা গ্রাহ্য হয় না। পুনঃপ্রকাশের ক্ষেত্রে স্বস্তিকা-র সম্পাদকীয় বিভাগই লেখা নির্বাচন করে থাকে।
- গ্রন্থ-সমালোচনার জন্য দু'টি বই পাঠাবেন।
- স্বস্তিকায় প্রদত্ত লেখা অন্যত্র পাঠানো অনুচিত। এক বছরের মধ্যে লেখা প্রকাশিত না হলে আমাদের জানিয়ে অন্যত্র পাঠানো যেতে পারে।
- লেখার মধ্যে কোনো উদ্ধৃতি থাকলে তার সূত্র অর্থাৎ গ্রন্থের নাম, গ্রন্থকার, প্রকাশক, সংস্করণ, পৃষ্ঠা ইত্যাদি পরিষ্কার ভাবে উল্লেখ থাকা প্রয়োজন।
- রচনা মনোনয়ন ও প্রকাশনার ব্যাপারে (পরিবর্তিত/ পরিমার্জিত) সম্পাদকের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।
- লেখার সঙ্গে মূল্যবান নথিপত্র থাকলে তা লেখক-লেখিকারা নিজ উদ্যোগে ফিরিয়ে নেবেন।

SURYA

EVERY CITY EVERY HOME

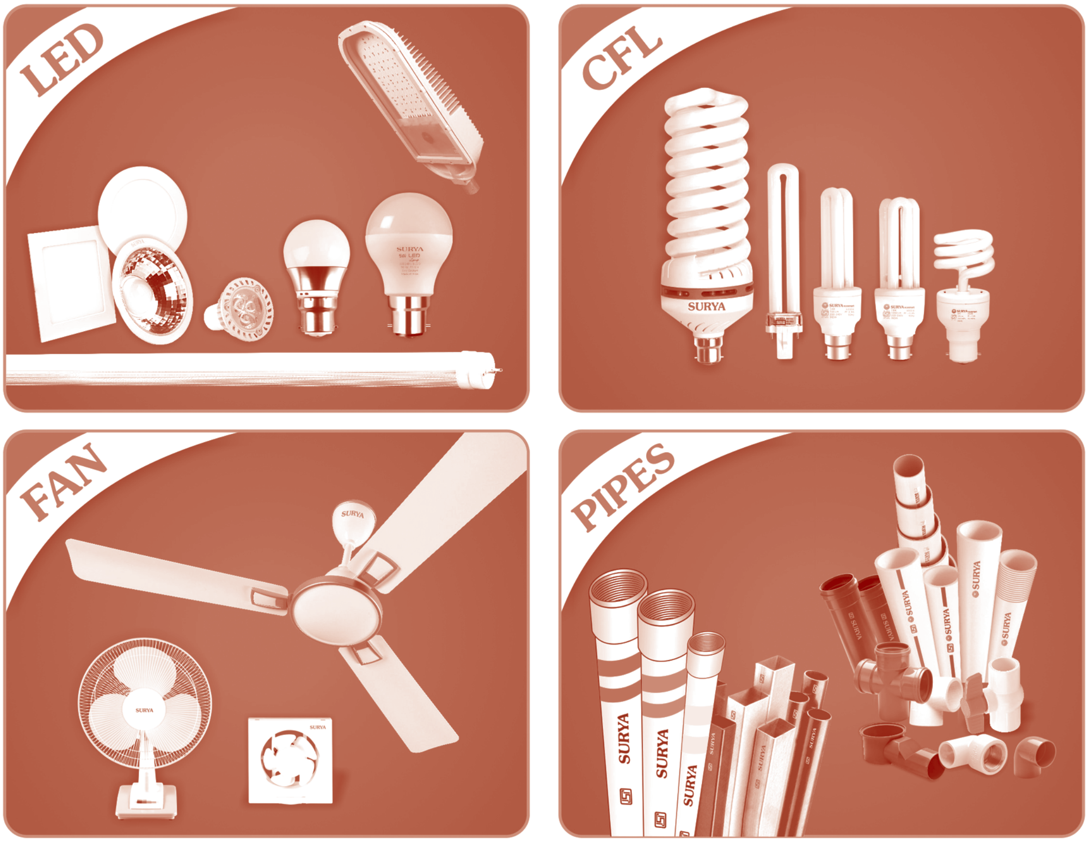

The biggest Indian MultinatiOnal SURYA showcases the best of lighting solutions, unmatched range of fans and quality pipes that touches the live of people from

EVERY CITY EVERY HOME

SURYA ROSHNI LIMITED

Padma Tower-1, Rajendra Place, New Delhi-110008 (INDIA)
Tel. : +91-11-25810093-96 Fax : +91-11-25789560
Email : consumercare@sroshni.com Website : www.surya.co.in

CENTURYPLY®

CENTURYPLY®

CENTURYLAMINATES®

CENTURYVENEERS®

CENTURYMDF®

CENTURYPRELAM®

For any queries, SMS 'PLY' to 54646 or call us on 1800-2000-440 or give a missed call on 080-1000-5555

E-mail: kolkata@centuryply.com | CenturyPlyOfficial | CenturyPlyIndia | centuryplyindia | Visit us: www.centuryply.com

Swastika Weekly, RNI No. 5257/57 Postal Registration No. Kol. RMS/48/2013-2015
8 June - 2015 - Rs. 10.00

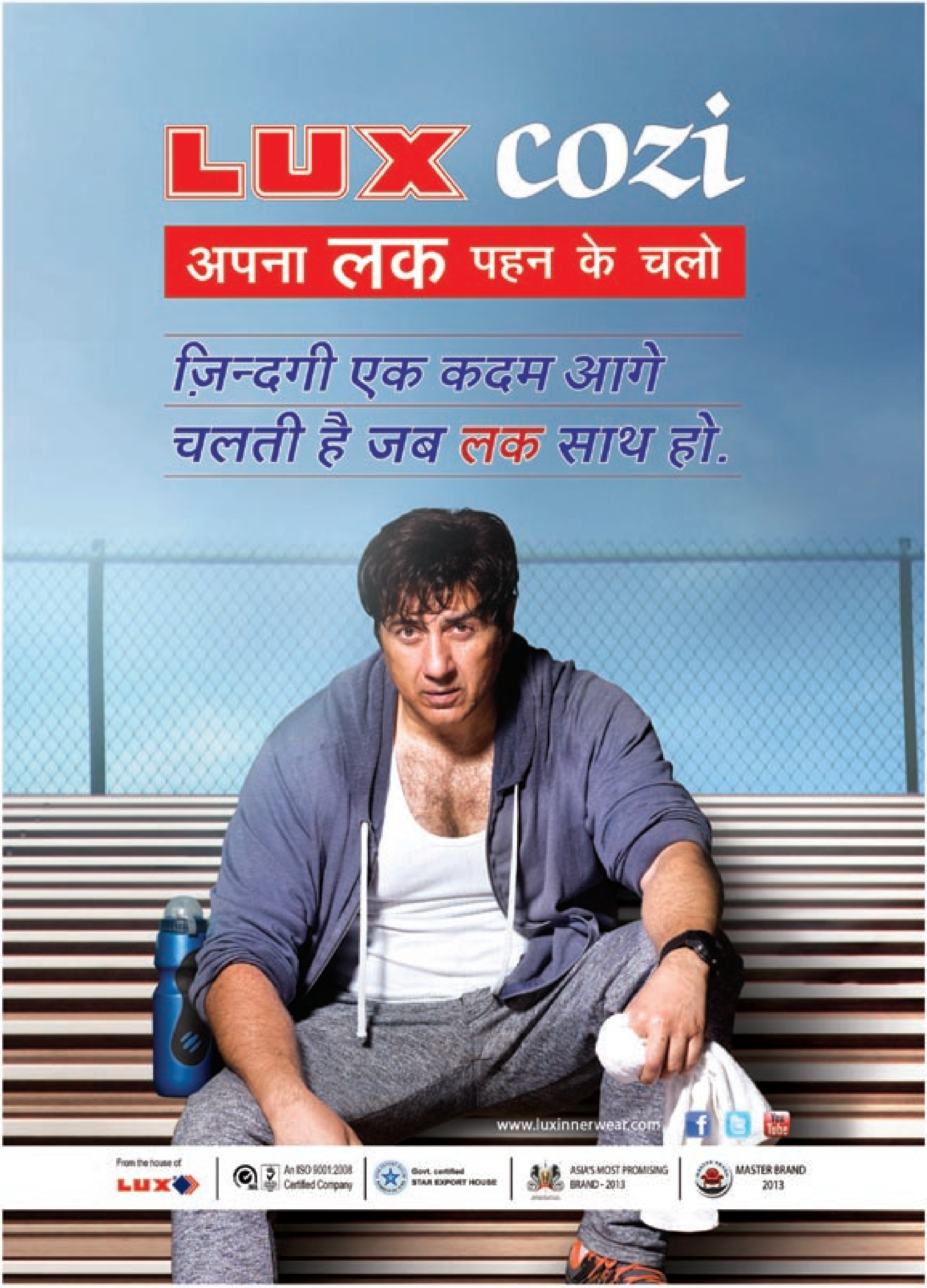

দাম : ১০.০০ টাকা